শ্রীকান্ত → শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জন্ম → ১৮৭৬ খ্রি:   মৃত্যু:- ১৯৩৮ খ্রি:

জন্মস্থান:- হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে

পিতা:- মতিলাল চট্টোপাধ্যায়।

* শরৎচন্দ্রের প্রথম রচনা – মন্দির নামক ছোটগল্প। এটি লিখে তিনি কুন্তলীন পুরস্কার পান।
* শ্রীকান্তের প্রথম মুদ্রিত উপন্যাস – বড়দিদি (১৯১৩)
* মৃত্যুর পর রচিত – শুভদা (জুন ১৯৩৮)
* শেষ অসমাপ্ত উপন্যাস – (শেষের পরিচয় (১৯৩৯)
* জীবিতকালে প্রকাশিত শেষ উপন্যাস – বিপ্রদাস (১৩৪১/২, ১৯৩৫)

উপন্যাস সমগ্র ঃ–

দেনাপাওনা (১৯১২), বড়দিদি (১৯১৩), বিরাজবৌ (১৯১৪)
বিন্দুর ছেলে (১৯১৪), পরিণীতা (১৯১৪), পণ্ডিতমশাই (১৯১৪)
মেজদিদি (১৯১৫), পল্লীসমাজ (১৯১৬), মেজদিদি (১৯১৫)
বৈকুণ্ঠের উইল (১৯১৬), চন্দ্রনাথ (১৯১৬), চরিত্রহীন (১৯১৭)
দত্তা (১৯১৮), গৃহদাহ (১৯২০), বামুনের মেয়ে ১৯২০)
নববিধান (১৯২৪), পথের দাবী (১৯২৬), বিপ্রদাস (১৯৩৫)

* শ্রীকান্ত উপন্যাস চারটি পর্বে বিভক্ত

* শ্রীকান্ত (১ম) – ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯১৭ খ্রি:।
* শ্রীকান্ত (২য়) – ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯১৮ খ্রি:।
* শ্রীকান্ত (৩য়) – ১৮ ই এপ্রিল ১৯২৭ খ্রি:।
* শ্রীকান্ত (৪র্থ) – ১৩ ই মার্চ ১৯৩৩ খ্রি:।
* ১৩২২ বঙ্গাব্দে মাঘ মাস থেকে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।
* ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রকাশের সময় শ্রীকান্ত উপন্যাসের নাম ছিল শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনি, লেখক শ্রীকান্ত শর্মা নামে প্রকাশ হয়।

* নারীর মূল্য প্রবন্ধে তিনি অনিলা দেবী ছদ্মনাম ব্যবহার করেন।

* শ্রীকান্ত উপন্যাসের অন্তর্বস্তু আলোচনা

(১ম - পরিচ্ছেদ)

* শ্রীকান্ত কোন জাতীয় উপন্যাস

=> শ্রীকান্ত আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। অন্যভাবে বললে ভ্রমণকাহিনীভিত্তিক উপন্যাস।

* শ্রীকান্ত উপন্যাসের প্রথম বাক্য —

আমার এই ভবঘুরে জীবনের অপরাহ্ন বেলায় দাঁড়াইয়া ইহারই একটা অধ্যায় বলিতে বসিয়া আজ কত কথাই না মনে পড়িতেছে।

* শ্রীকান্ত উপন্যাসের শেষ বাক্য —

"যে জীবন তুমি দান করিলে, যে জীবনের অপরাধগুলোর কালিমা আর না তোমার অপমানের ক্ষতি —দূরে থাকিলেও এ সংকল্প আমি চিরদিন অক্ষুণ্ণ রাখিব।

* উপন্যাসের মধ্যে লেখকের কয়েকটি বিখ্যাত উক্তি —

* "ভ্রমণ করা এক, তাহা প্রকাশ করা আর। যাহার পা দুটো আছে সেই ভ্রমণ করিতে পারে, কিন্তু হাত দুটি থাকিলেই তো আর লেখা যায় না। সে যে ভারি শক্ত।" [illegible]

* "— ভগবান আমাকে মতি-কল্পনার কবিত্বের বাষ্পটুকু দেন নাই। এই দুটো পোড়া চোখ দিয়া আমি যা কিছু দেখি ঠিক তাই দেখি।"

* "আহার করা ভিক্ষে সৃষ্টি হয় না চলে না। চলে শুধু মানুষ মেরে ভিক্ষা করে।"

* শ্রীকান্তের ভবঘুরে হয়ে যাওয়ার পিছনে কোন চরিত্রের প্রভাব রয়েছে? ইন্দ্রনাথের

> শ্রীকান্তের ভবঘুরে হওয়ার পিছনে ইন্দ্রনাথের প্রভাব [illegible] ছেলেবেলা থেকে [illegible]

* সতীর্থ রূপে কামড়াকামড়ি স্কুলে যে ঠাকুর সাজতো? — সে কোন বাড়ীর ছেলে ছিল?

⇒ ইন্দ্রনাথ। ইন্দ্র যে বিশিষ্ট অতি কেন্দ্রী ঘরের ছেলে ছিল।

* 'যার ভয় নেই প্রাণের মায়া নেই — সে কেন হাতে কান্না নিয়ে ফিরতে পারবে না?' — কে কার সম্পর্কে একথা বলেছে? — সে কেন কান্না নিয়ে ফিরে আসছে?

⇒ বড়দা ইন্দ্রনাথ সম্পর্কে একথা বলেছে। সে [illegible] এ [illegible] দিয়ে এসেছে।

* ইন্দ্রনাথ স্কুলে যেত না কেন?

⇒ জানালাটি ইন্দ্রনাথ একদিন নিদ্রিত পণ্ডিত মশায়ের শিখাটি কেটে তার হাতের মধ্যেই রেখে দেয়। তখন হেডমাস্টার মশায় ইন্দ্রনাথকে শাস্তি দিতে চাইলে সে তাঁর পিঠের উপর কী একটা ফেলে, ছুটে, পাঁচিল টপকে চলে আসে আর যায়নি।

* হেডমাস্টার ইন্দ্রনাথকে কী শাস্তি দেওয়ার আয়োজন করেছিল?

⇒ হেডমাস্টার ইন্দ্রনাথকে গাধাটুপি পরাবার আয়োজন করেছিল।

* 'সে দিনটা আমার খুব মনে পড়ে।' — দিনটা কি রকম ছিল?

⇒ শ্রাবণের শেষে বেলা। অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত। আকাশটা মেঘে সমাচ্ছন্ন।

* শ্রীকান্তের সঙ্গে আর কে কে মেজদার কাছে পড়ত?

⇒ শ্রীকান্তের সঙ্গে ছোড়দা ও যতীনদা মেজদার কাছে পড়ত।

* শ্রীকান্তের পিসিমার কয় ছেলে? তাদের নাম কী?

⇒ শ্রীকান্তের পিসিমার চার ছেলে — বড়দার নাম নবীন, মেজদার নাম সতীশ, ছোড়দার নাম রমেশ, এবং ছোট ছেলের নাম যতীন।

* শ্রীকান্তরা কোন ঘরে পড়তে বসত?

⇒ বৈঠকখানা ঘরে পড়তে বসত।

* "আত্মরক্ষার যে কৌশলটি সেকালিকা শিখাইয়াছিল? দিলে, তাহলে অতিরিক্ত আর কিছু রহিল না।"

→ ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্তকে সাথে নিয়ে অন্ধকার রাত্রিতে মাছ চুরি করার জন্য গঙ্গার প্রবলস্রোতে ডিঙি ভাসিয়ে দিয়েছিল। একে অন্ধকার স্রোতের প্রবল বেগে নৌকাটিকে ঠিক পথে চালানো যাচ্ছিল না। তার উপর নদীর প্রবল স্রোত গঙ্গার পাড় ধসে পড়ছিল। যে কোন সময় পাড় থেকে মাটির অংশ বিরাট চাঙড় ভেঙে তাদের নৌকার উপর পড়লে তাৎক্ষণিক তাদের সলিল সমাধি হতে পারে। নৌকাটিকে সঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ইন্দ্র দাঁড়টি শ্রীকান্তর হাতে দিয়ে হালটি তুলে নিল নিজের হাতে। তারপর খালের ভিতর ঢুকে শ্রীকান্তকে সতর্ক করে দিয়ে বললো — অদূরে জেলেরা মাছ পাহারা দিচ্ছে, সেখানে আগে টের না পেলে জেলেরা তাদের মাথা গুঁড়িয়ে শেষ করে ফেলবে। এই শুনে শ্রীকান্ত ভয় পেয়ে তৎক্ষণাৎ ফিরে আসতে চাইলো; কিন্তু ইন্দ্র তাকে সাহস দিয়ে বলল যদি তারা টেরই পেলে তাতেও ভয়ের কিছু নেই। ঝুপ করে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে এক ডুবে যতদূর যাওয়া যায় গিয়ে ভেসে উঠলেই হলো। অন্ধকারে কেউ তাদের দেখতে পাবে না। তারপর কম সাত ক্রোশ সাঁতরে ঝাউয়ের চড়ায় উঠে ভোর বেলায় হেঁটে না হয় সাঁতরে গঙ্গা পেরিয়ে বাড়ী ফিরে গেলেই সব ল্যাঠা চুকে যাবে। ইন্দ্রনাথের মতে এটাই আত্মরক্ষার সহজ পথ।

* "এ শুধু খেলা নয়! জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া এই আত্মত্যাগ এই বয়সে কয়টা লোক করিয়াছে? ঐ যে বিনা আড়ম্বরে সামান্যভাবে বলিয়াছিল মরতে তো একদিন হবেই, এমন সত্য কথা বলিতে কয়টা মানুষ দেখা যায়?"

→ শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথ মাছচুরি করে ফেরিয়ে আসার সময় জেলেরা হয়তো বুঝতে পেরে যাওয়ায় তাদের ধাওয়া করে। বুঝতে পারার সাথে সাথে ইন্দ্রনাথ প্রাণপণে লগি ঠেলে নৌকাটিকে চড়ার ভিতর ঢুকিয়ে দেয়। সেখানে ঝুঁজি আর ঝাউয়ের ক্ষেত। জল কোথাও এক বুক কোথাও আবার এক কোমর, আর কোথাও বা এক হাঁটু। সেই জঙ্গলে অক্লান্ত পরিশ্রম করে নৌকা টানতে টানতে ইন্দ্রনাথ এগিয়ে চলছিল বড় গাঙের পথের জন্য।

ঝড় দেখার গেল ইন্দ্রনাথ নৌকার মুক্তি-নেশা প্রবলভাবে পেয়ে বসেছে। ও দুটো জেলে নৌকার। সেই নৌকাগুলোর মধ্যে ছিল মাছের স্তূপের, আর ছিল অনেক মাছ — চিংড়ি, বোয়াল, আমড়ো, ভেটকি। এই মুহূর্তে হঠাৎ শ্রীকান্তের মন কিছুতে উঠিল না। মাঝ গঙ্গায় মাঝে মাঝে ধপাস্ ধপাস্ শব্দ হলে পড়তে লাগল। নৌকাটির আবার তাদের নৌ ঠেকে ঠেকিয়ে গেল। কিন্তু তাদের দিকে গ্রাহ্য করল না ইন্দ্রনাথ। দুজনে একটা অভিজ্ঞতার মত দেখিয়েছে তাদের — ওরা নিজেরাই চুরি ধরবার ব্যবসা করছে। আর ও চুরি যদি করতো তবে দোষটা কী? হয়তো সেটাও দিন হবেই।

ইন্দ্রনাথের এই অভিজ্ঞতাদের কথা শুনে অবাক হয়ে গেল শ্রীকান্ত। কতই বা বয়স ইন্দ্রনাথের। তবু এত বড়ো সত্য কথাটি সে সহজভাবে বলতে পারলো কেমন করে? যেখানে প্রতি মুহূর্তে মানুষের মৃত্যু হতে পারে, কেবল একটি কেবল মাত্র, সেইখানে প্রতিদিনের কথা বলে মৃত্যুকে উপহাস করার শক্তি সকলের থাকে না। 'মরিবারে মরিতে হবে' একথা আমরা সকলেই জানি, তবু জীবনকে আমরা মুখেই ভালো বাসি। জীবনমৃত্যুর মাঝখানে আমরা অসহায় থাকি। মৃত্যুর মুহূর্তেও আমরা একমাত্র ভগবানকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চাই। কিন্তু ইন্দ্রনাথ যেন অতি সহজে মৃত্যুকে বরণ করে নিতে চায়।

* এমনিই মানুষের স্বাধীনতার মূল্য (৩/৪)

→ মেজদার শাসন থেকে মুক্ত হয়ে বালক শ্রীকান্ত, যতীনদা ও ছোড়দা যে আনন্দ পেয়েছিল, তার প্রেক্ষিতেই শ্রীকান্তের এই আত্মোপলব্ধি।

অতি শাসন মানুষের স্বাধীনতাকে অনেক সময় সংকুচিত করে। শ্রীকান্তের মেজদা বাড়ির ছেলেদের এমন শাসনে রাখতো যে তারা ভয়ে অস্থির হয়ে উঠত। ইন্দ্রনাথের সঙ্গে দীর্ঘ সময় কাটিয়ে শ্রীকান্ত রুক্ষচুল ও একান্ত শুষ্ক ম্লান মুখে বাড়ি ফিরে আসে। তার আকস্মাৎ আগমেন বার্তা মেজদার কানে গেল। শাস্তি দেবার মহেন্দ্রক্ষণে তার সামনে উপস্থিত হল পিসিমারা — 'এমন সব ছেলের হাত পা বেঁধে জলবিছুটি দিলে তবে আমার রাগ যায়' বলে শাসালেন।

কিন্তু মেজদা তাকে শাস্তি থেকে রেহাই দিতে চাইলেন না। পিসীমা নির্দেশ করলেন তিনি যেন শ্রীকান্তকে তার সঙ্গে করে নিয়ে না যান। মেজদার এই ঔদ্ধত্যে বিরক্ত পিসিমা বাড়ির ছেলেদের পড়ানোর একচ্ছত্র অধিকার থেকে নিবৃত্ত করলেন।—

"আর যেন কারো গায়ে যদি তুই হাত দিস, আমি জানতে পারি, এই থামে বেঁধে চাবুক দিয়ে তোকে আমি তো দেখাব! ছোঁড়া নিজে কি বছর ফেল হচ্ছে— ও আবার যায় পরকে শাসন করতে।"

এই ভাবে মেজদার শাসন থেকে মুক্ত হয়ে বাড়ির ছেলেরা আনন্দে আপ্লুত হয়ে উঠল। এ আনন্দ স্বাধীনতার মূল্য থেকেই নির্ধারিত হয়। এটা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ন্যায্য অধিকার। এ অধিকার মানুষের আজন্ম অধিকার।

* শ্রীকান্ত উপন্যাস অবলম্বনে হাস্যরস সৃষ্টিতে শরৎচন্দ্রের দক্ষতা- আলোচনা কর।

→ "Man is a laughing animal" — তাইতো মানুষের মধ্যে sense of humour আছে। তবে 'পাচ্ছে হাসি হাসছি তাই' সাহিত্যের হাসি কিন্তু সেরকম নয়। অসঙ্গতি ও বৈষম্য থেকেই হাস্যরসের সৃষ্টি।

রবীন্দ্রনাথের মতামত রবীন্দ্রনাথের মতে "ইচ্ছার সঙ্গে অবস্থার, কার্যের সঙ্গে কারণের, উদ্দেশ্যের সঙ্গে উপায়ের অসঙ্গতি হাস্যরসের সৃষ্টি করে।"

হাস্যরসের বিভাগ সাহিত্যের হাসিকে মূলত চারটি ভাগে ভাগ করা যায় — (i) Humour (শ্রেষ্ঠ হাস্যরস) — এ হল নির্মল শুভ্র মধুমত হাস্য।
(ii) wit (বাকচাতুর্য) — অর্থাৎ কথার চমৎকারিত্ব সৃষ্টিকারী হাস্য।
(iii) Satire (ব্যঙ্গহাস্য) — ব্যক্তি বা সমাজের ত্রুটি বিচ্যুতিকে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করে হাসানো।
(iv) Fun (লঘু হাস্য) — উদ্ভট ঘটনা, অশ্লীল দৃশ্যের অবতারণা করে হাসানো।

প্রথম ও শ্রেষ্ঠ হাস্যরস বাংলা সাহিত্যে নির্মল শুভ্র মধুমত হাস্য প্রথম অবতারণা করেন বঙ্কিমচন্দ্র। তার এই ধারার শ্রেষ্ঠ উত্তরসূরী হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজশেখর বসু, শিবরাম চক্রবর্তী প্রমুখেরা। শরৎচন্দ্র ও তাঁর শ্রীকান্ত উপন্যাসে হাস্যরস সৃষ্টিতে হিউমার, উইট, স্যাটায়ার প্রভৃতি ভালো মাত্রায় প্রয়োগ করেছেন।

মেজদার অবলম্বনে হাস্যরস শ্রীকান্ত উপন্যাসের সূচনাতেই আছে মেজদার অধ্যয়ন প্রসঙ্গ। পরীক্ষার পড়ায় যাতে এতটুকু ব্যাঘাত না ঘটে সেজন্য মেজদার অপূর্ব Manarism বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়। ছোটদাদা, যতীনদাদা প্রভৃতির সঙ্গে সান্ধ্য- তার অভিযান সামিল হত — পড়াশুনার লক্ষ্যের চেয়ে উপলক্ষ্যটাই বড় হয়ে উঠেছে। এ যেন পড়ার পড়া হয়না। আর তার পরে লেখকের সরস মন্তব্য — "পড়াশুনার পর তারা যখন ঘুমোতে যেত তখন মা সরস্বতী তাদের চৌকাঠ পার করে দিতেন। আর পরের দিন বিদ্যালয়ে গিয়ে তারা যে অপূর্ব সম্মান এবং সৌভাগ্য তা সহজেই অনুমেয়।"

ছিনাথ বহুরূপী প্রসঙ্গ

ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র শ্রীকান্ত উপন্যাসে বহুরূপী ছিনাথ বহুরূপীর প্রসঙ্গের মাধ্যমে Fun, উপন্যাসের অংশগুলো প্লাবিত করেছেন। মেজদার সেদিন উচ্চৈঃস্বরে পাঠ শুরু করে অজ্ঞান হয়ে গেছেন। সারা বাড়িতে যখন হুলস্থূল তখন পিসেমশাই ওরে দুই ছেলেকে বাঘে ধরেছে 'সড়কি-লও বন্দুক লও' বলে চিৎকার করতে থাকেন। অন্য দিকে আবার সন্তুষ্টি সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। বুড়ো রামকমল ভট্টাচার্যের মতে এটি একটি প্রকাণ্ড ভালুক। মেজদার মতে সে রয়েল বেঙ্গল টাইগার আর সতীনদার মতে সে একটা অন্য নেকড়ে বাঘ। হুলুস্থূল চিৎকারে যখন সবাই কেউ বলে ভুল করে দেউড়ির দারোয়ানরা বুড়ো রামকমল ভট্টাচার্যকে বেদম উত্তম-মধ্যম দিয়ে বসেছে। তাই বাঘের প্রকৃত পরিচয় জানার পর তিনি ছুটে গেছেন ছিনাথ বহুরূপীর কাছে। সড়কি দিয়ে প্রহার করতে করতে বলেছেন— "এই হারামজাদা বজ্জাতের জন্যে আমার গতর চূর্ণ হয়ে গিয়েছে। ঘোড়া শালার ব্যাটারা আমাকে কিলায়ে কাঁঠাল পাকায়ে দিছে— এই মন্তব্যে হাস্যরসের ছলনা কৌতুক মাখিয়ে রোমাঞ্চ ছড়ায়।

বাঘের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটিত হওয়ার পর পিসেমশাই নির্দেশ দিয়েছিলেন— 'উহার ল্যাজ কাটিয়া দাও।' এর উত্তরে পিসিমার ব্যঙ্গাত্মক কথাবার্তা বেশ কৌতুককর— 'রেখে দাও তোমার ওটা অনেক কাজে লাগবে।' কাল্পনিক উক্তিকে অবলম্বন করে কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকের এই অদ্ভুত আচরণ Fun বা হাস্যরসকে ঘনীভূত করেছে।

সাধু মিস্ত্রির প্রসঙ্গ

অন্য মিস্ত্রিদের অভিযান প্রসঙ্গে আবার Fun এসেছে মেঘনাদের হাত ধরে। পণ্ডিতদের প্রসঙ্গে গোপন রহস্য দেখার আকাঙ্ক্ষা কার্য হত্যার দ্বারা আমাদেরকে অভিভূত করে রেখেছে। সেইজন্য উনার মেঘনাদের অদ্ভুত বীরত্ব সত্যিই মজাদার। যদি বস্ত্র খুলে গেলেও তবু অসম সাহসিকতাই দেখে স্কুল শিক্ষকও বলতে বাধ্য হয়েছে— 'এক তীর এক বীর' ধনুক না থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র তীর দিয়ে যুদ্ধ করে শত্রুকে পরাস্ত করার এমন অলৌকিক ঘটনা বাল্মীকি কিংবা কৃত্তিবাসেরও কল্পনার অতীত।

জেলেদের প্রসঙ্গ

Fun এর পাশাপাশি বিশুদ্ধ Humour এর দৃষ্টান্ত ও দুর্লভ নয়। ইন্দ্র অভিযানে গিয়ে জেলেদের মাছ চুরি করার সময় ডিঙি ঠেলিতে দিয়ে শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথ যখন নৌকা চালাচ্ছে তখন মাছেরা লাফ দিয়ে নৌকায় শ্রীকান্তকে উদ্দেশ্য করে কিনারায় 'মাছগুলো আমার উপর দিয়ে বুকে লাফায়ে ভাগছে।'

এই সময়ে ছুরাতে ঠাকুর পাখির প্রাণটা বলে মেজদা দীর্ঘ ছড়িত শ্রীকান্ত-ও হয়ে গৌরবে মাতামালে রয়েছে। এমন তার মনোভাব অবস্থা।
–"কাজী খুড়োর মা হইলেও বাচ্চা বিচার নয় তো?"

নতুনদাদার প্রসঙ্গ — নতুনদাদার প্রসঙ্গে আবার লেখক কলকাতার বাবুসম্প্রদায়কে তীব্র ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করেছেন।

নতুনদাদার মতো বাবুদের কটাক্ষ করেই তো শরৎচন্দ্র লিখেছেন – আমরা হ্যাট, বুট আর প্যান্ট কোট পরে বিলিতি বাঁদর। নতুনদার অপূর্ব বেশবাস, শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথের প্রতি তীব্র ঘৃণা, নৌকায় বসে সংগীতচর্চা করতে আকাঙ্ক্ষা হয়ে কুকুরের দলের তাড়ায় শীতের রাতে বরফ ঠান্ডা জলে অবগাহন + এসবই satire এর চূড়ান্ত উদাহরণ। আর এর থেকে উঠে এল তার দরিদ্রদের প্রতি প্রথম মন্তব্য – 'আমার একপাটি পাম্প' – তো সার্থক হাস্যরসের উদাহরণ।

এছাড়াও রাজলক্ষ্মীর হাতে নাপিত ভূত্য রতনও তার কাজকর্মের নিজের অজান্তেই যে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে হাস্যরসের আসর থেকে তাকেও অনায়াসে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। অর্ধমুদ্রিত চক্ষু বারবনিতা এই হাস্যরসের আর একটি প্রতীক। তার আসল পালনে গানের উপর, ছেলেদের ঘাড়ে বসে ভোজন, বাঁশপাতা দেওয়া আচার ব্যবহার সবই হাস্যকর।

এইভাবেই 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে জীবনরসিক শরৎচন্দ্র উপন্যাসের বিচিত্র ঘটনাবলী এবং উক্তি প্রত্যুক্তিতে হাস্যরসে সিক্ত করে পাঠকদের যথেষ্ট Relief দিয়েছেন।

চর্যার আবিষ্কার – নামকরণ – রচনাকাল

আবিষ্কার

চর্যাগীতি বা চর্যাপদাবলীর আবিষ্কার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা, এর একটু পূর্ব ইতিহাস আছে। উনিশ শতকের শেষদিকে রাজেন্দ্রলাল মিত্র সর্বপ্রথম বৌদ্ধতান্ত্রিক সাহিত্যের বিচিত্র বিষয়, তত্ত্ব দর্শন ও আকৃতি পূর্ণ পরিচয়ের রূপ সম্বন্ধে ইংরেজী জানা পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি নেপাল থেকে এই বিষয়ের কিছু পুঁথি উদ্ধার করেন। এদের মধ্যে কিছু নির্বাচিত পুঁথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে তিনি ১৮৮২ খ্রীঃ 'Sanskrit Buddhist Literature in Nepal' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর মহামহোপাধ্যায় ড: হরপ্রসাদশাস্ত্রীর উপর অনুসন্ধানের ও প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহের ভার দেন। রাজেন্দ্রলালের গ্রন্থ ও অন্যান্য প্রমাণের ভিত্তিতে হরপ্রসাদ অনুমান করেন যে, নেপালের নানাস্থানে বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত নানা পুঁথি সংরক্ষিত আছে এবং তাদের মধ্যে বাংলা সাহিত্য ও বাঙালির ধর্মজীবনের মূল্যবান উপাদান থাকিতে। এই সব উপাদান সংগ্রহের জন্য তিনি ১৮৯৭ খ্রীঃ এককভাবে প্রথমবার, ১৮৯৮ খ্রীঃ বৌদ্ধশাস্ত্রবিশারদ অধ্যাপক বেন্ডেলের সঙ্গে দ্বিতীয়বার এবং ১৯০৭ সালে নিজেই তৃতীয়বার নেপালে যাত্রা করেন। এবার তিনি নেপালের রাজকীয় গ্রন্থাগার থেকে ~~চর্যাচর্যবিনিশ্চয়~~ 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' ('চর্যাগীতিকোষ'), সরহপাদের অবহট্‌ঠে রচিত 'দোহা', অদ্বয়বজ্রের সংস্কৃতে রচিত সহজাম্নায় পঞ্জিকা' নামে টীকা, কৃষ্ণাচার্যের দোহা এবং আচার্যপাদের সংস্কৃতে রচিত 'মেখলা' নামে একটি টীকা সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন। দ্বিতীয়বার নেপালযাত্রায় তিনি 'ডাকার্ণব' নামে একটি পুঁথি সংগ্রহ করে এনেছিলেন। ১৯১৬ খ্রীঃ (১৩২৩ বঙ্গাব্দ) কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ থেকে হরপ্রসাদশাস্ত্রী – 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়', সরহের দোহা, কৃষ্ণাচার্যের দোহা ও 'ডাকার্ণব' – এই চারটি বইকে একত্রে নিয়ে '<u>হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা</u>' নাম দিয়ে সম্পাদকীয় ভূমিকাসহ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস নতুন করে লেখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল।

হরপ্রসাদশাস্ত্রী সহজভাবে ধরেছিলেন – 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' (চর্যাগীতি কোষ) এবং অপর তিনটি পুঁথির ভাষা প্রাচীনতম বাংলা ভাষার নিদর্শন। কিন্তু ১৯২৬ খ্রীঃ ড: সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় '<u>The origin and Development of the Bengali Language</u>' গ্রন্থে নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেন যে, শাস্ত্রী সংগৃহীত শুধু প্রথম পুঁথি অর্থাৎ 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' প্রাচীনতম বাংলা ভাষায় রচিত। বাকি তিনটি গ্রন্থের ভাষা শৌরসেনী বা পশ্চিমা অপভ্রংশ (অবহট্‌ঠ)।

'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' – এই গ্রন্থটির আবিষ্কার নানাদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমত: এই আবিষ্কারের ফলে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া গেল। এর আগে ড: দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ', ডাক ও খনার বচন প্রভৃতি বিচ্ছিন্ন রচনাকে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের আদি নিদর্শন বলেছিলেন। চর্যাপদগুলি আবিষ্কৃত হওয়ায় এই ভ্রান্তধারণা অনেকাংশে পরিত্যক্ত হল।

দ্বিতীয়ত: বাংলাভাষার আদিস্তরের রূপতাত্ত্বিক এবং ধ্বনিতাত্ত্বিক অনুশীলিত এবং সুস্পষ্ট হল।

তৃতীয়ত: বাংলাসাহিত্যের পরবর্তী নিদর্শন – কীর্তন-পদাবলী, শাক্তপদাবলী ও বাউলগানের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে এই আদিতম নিদর্শনের যোগসূত্রটি খুঁজে পাওয়া গেল।

বস্তুত: 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' আবিষ্কৃত না হলে প্রাচীনতম বাঙালির জীবনচর্যায় ও অধ্যাত্মচেতনার ছবি আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত হত না।

নামকরণ

'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' মতবাদী: প্রথম প্রকাশের মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখেছিলেন – "১৯০৭ সালে নেপালে গিয়া আমি অনেকগুলি পুথি দেখিতে পাইলাম। তাহার একখানির নাম 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়'।" অনুমানে নামটি নিছক পুথির মূল চর্যাগান অথবা সংস্কৃত টীকার মধ্যে কোথাও নেই, পুথিটির 'ভূমিকা' পাওয়া যায়নি, যেখানে সাধারণতঃ গ্রন্থনাম থাকার কথা। অন্যান্যের কাছে নেই। ডঃ শাস্ত্রী মূলতঃ এই টীকাগ্রন্থের নাম 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' দিলেন কেন? মনে হয় তিনি চর্যাগানগুলির প্রকৃতি অনুসারে অনুমান দিয়েছেন। 'চর্য্য' শব্দের অর্থ আচরণীয় এবং 'অচর্য্য' – শব্দের অর্থ – অনাচরণীয়। যে গানগুলির মাধ্যমে বৌদ্ধ সহজযানী সাধকদের আচরণীয় ও অনাচরণীয় সম্বন্ধে নির্দেশ দেয়া যায় তাদের সংকলনগ্রন্থের নাম 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' হওয়া কিছু অসংগত নয়। 'চর্য্য' ও 'অচর্য্য' শব্দ যথাক্রমে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কিত বিধি ও নিষেধ বোঝানো যায়। নানা চর্যাগানে এই বিধি ও নিষেধের উল্লেখ আছে, যেমন ৫ নং পদে চর্যায় বিধিমুখে বলা হয়েছে – "যই তুম্হে লোঅ হে হোই পারগামী / পুচ্ছতু চাটিল অনুত্তরসামী।" অর্থাৎ "যদি তোমরা লোকেরা পারগামী হতে চাও, তবে সেই স্বামী (গুরু) চাটিলকে জিজ্ঞাসা করো।" আবার ১নং চর্যায় লুইপাদ বলেছেন – "এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস / সুনুপাখ ভিড়ি লাহুরে পাস।" – এখানে নিষেধ ও বিধি একসঙ্গে আছে। আবার ৩২ সংখ্যক চর্যায় রয়েছে সরহের নিষেধ – "নি অড্ডি বোহি, মা জাহুরে লাঙ্ক।" অর্থাৎ হরপ্র-শাস্ত্রীর দেওয়া 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' নামটি চর্যাগান গুলির প্রকৃতি নির্ভর।

পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মনে করেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'চর্য্যাচর্যবিনিশ্চয়' নামটি 'নির্মলগিরা' টীকার একটি ভ্রষ্টপাঠের উপর নির্ভর করে দিয়েছিলেন। বিধুশেখরের মতে টীকার 'আশ্চর্যচর্যাচয়' – কথাটিই অনুমানের ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু মনীন্দ্রমোহন বসু তাঁর সম্পাদিত 'চর্য্যাপদ' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন – "এখানে 'আশ্চর্য্য' শব্দটি টীকাকার কর্তৃক চর্য্যার বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, গ্রন্থের নামের সহিত ইহার কোনই সম্বন্ধ নাই।" বিধুশেখর শাস্ত্রী চর্যাপদাবলীর নাম নির্ধারণ করেছেন – 'আশ্চর্যচর্যাচয়' – যা ঠিক নয়, আবার ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী তিব্বতী অনুবাদের অবলম্বনে গ্রন্থের নাম নির্দেশ করেছেন – 'চর্য্যাশ্চর্য্যবিনিশ্চয়'। এটিও অযৌক্তিক নয়, তবু অর্থ আশ্চর্য চর্যাসমূহের বিধি ও নিষেধ নির্ণয়। অবশ্য অনেক বৌদ্ধদের ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কিত গ্রন্থাদিতে 'বিনিশ্চয়' জাতীয় নাম প্রচুর পাওয়া গেছে। যেমন হেবজ্রের গ্রন্থ – 'ধর্মবিধাবিনিশ্চয়'। তবুও এই ধরনের বিভিন্ন মতে চর্যার নামকরণ জোরালো নয়, যথাযথ নয়।

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে P.Cordier এর তেঙ্গুর অনুতালিকা (Bastanhgyur) থেকে ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী চর্যাপদাবলীর তিব্বতী অনুবাদ ও তিব্বতী টীকার সন্ধান পান। মূল চর্যাপদগুলি তিব্বতীতে অনুবাদ করেছেন শীলচারী এবং তাদের তিব্বতী টীকা লেখেন কীর্তিচন্দ্র। টীকায় এই অনুবাদ পুথির পুষ্পিকায় চর্যাপুথির নাম, তার সংস্কৃত টীকাকারের নাম, তিব্বতী-অনুবাদক ও টীকাকারের নাম – ইত্যাদি মূল্যবান তথ্য পাওয়া গেছে। এই প্রমাণ নিয়ে তিনি লিখেছেন যে মুনিদত্ত 'কোষ' সংকলন করেছিলেন। মানুষের বোধিপ্রাপ্তিকামনার জন্য আচার্য মুনিদত্ত তাদের মধ্যে থেকে পঞ্চাশটি পদ বেছে নিয়ে তাদের টীকা লেখেন। এই টীকা গ্রন্থের নাম – 'চর্যাগীতিকোষবৃত্তি'। সুতরাং 'চর্যাগীতিকোষ' – হল চর্যার পদসংকলনের নাম, এবং 'বৃত্তি' – হল তার টীকা। শাস্ত্রী নেপালে যে পুথিটি পেয়েছিলেন তা হল মুনিদত্তের সংস্কৃত টীকা সহ কোষ চর্যাগানের সংকলন। মূল ও টীকা নিয়ে পুথিটির প্রকৃত নাম তাহলে – 'চর্যাগীতিকোষবৃত্তি' এবং চর্যাসংকলনের নাম 'চর্যাগীতিকোষ'।

রচনাকাল

চর্যাগীতিগুলির সঠিক রচনাকাল নির্ণয়ে কিছু অসুবিধা আছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অবশ্য এগুলিকে 'হাজার বছরের পুরাণ' বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্ত গানগুলির প্রকৃত রচনাকাল নিরূপণের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী নয়। আসলে পুঁথিতে চর্যাপদের যে সংকলন পাওয়া যায় তা পুঁথির লিপি সর্বতোভাবে প্রথম রচনাকালের সমসাময়িক নয়, অর্থাৎ তা রচনার সমসাময়িক অথবা পুঁথিলিপির সমসাময়িক। সুতরাং পুঁথির কাল বিচার করে পদগুলির প্রকৃত রচনাকাল নিঃসংশয়ে নিরূপণ করা খুব কঠিন। তাছাড়া পদগুলির রচনাকাল কোনো নির্দিষ্ট শতাব্দীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না করে একটি কালপর্বের আনুমানিক কালসীমার মধ্যে স্থাপন করাই সঙ্গত।

চর্যা-কবিদের আবির্ভাবকাল সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্যাদি তেমন পাওয়া যায় না, প্রবাদ জনশ্রুতি ও কিংবদন্তী থেকেই তাঁদের আবির্ভাবকালের আভাস পাওয়া যায়। তাছাড়া রাহুল সাংকৃত্যায়ন চর্যাপদগুলিকে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর রচনা বলে মনে করেন। ড: শহীদুল্লাহও মনে করেন অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই চর্যাপদ রচিত। অপরপক্ষে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতে চর্যাপদের রচনাকালের সীমা দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে। কবিদের আনুমানিক আবির্ভাবকাল ছাড়াও সুনীতিকুমার ভাষাতাত্ত্বিক দিক থেকে সাহায্যেও চর্যাপদের রচনাকাল নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। এই বিচার অনুযায়ী চর্যার ভাষাকে তিনি চতুর্দশ শতকের শেষ পাদে রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর চেয়ে অন্তত দেড়শো বছরের পুরাতন বলে বিবেচনা করেছেন। এদিক থেকেও চর্যার রচনাকালের নিম্নসীমা দাঁড়ায় মোটামুটি দ্বাদশ শতকের দিকে। কবিদের সম্ভাব্য আবির্ভাবকাল ও চর্যাপদের ভাষাতত্ত্ব বিশ্লেষণ করে চর্যার রচনাকাল সম্পর্কে তিনি যে সিদ্ধান্ত করেছেন — "The period 950-1200 A.C. would thus seem to be a reasonable date to give to these poems, and they are preserved in a post-14th century MS." (ODBL, pt I, p.123)।

পদের বিষয়বস্তু ও ধর্মীয় ভিত্তি এবং পদের গঠনপদ্ধতি ও ভাষারীতি — পরোক্ষ এই দুই প্রমাণের ভিত্তিতেও চর্যার রচনাকাল অনুমান করা যায়। পালরাজাদের বৌদ্ধধর্মানুরক্তির সুযোগেই বাংলাদেশে মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিচিত্র সাধনাধারার প্রসার ঘটেছিল, পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী সেন রাজাদের সময়ে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থান-অভ্যুত্থানের জন্য এই ধর্মাচার ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে তুর্কী আক্রমণের পর শেষ পর্যন্ত নাথ, শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত প্রভৃতি অন্য সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে বিলীন হয়ে যায়। সুতরাং খুব শিথিল ভাবে ধরলে পাল রাজত্বের কালসীমাকেই চর্যাপদের রচনাকালের সম্ভাব্য সীমা বলা চলে। সেদিক থেকেও চর্যাপদের রচনাকালের ঊর্ধ্বতম সীমা অষ্টম শতাব্দী এবং নিম্নতম সীমা আনুমানিক দ্বাদশ শতাব্দী। আবার অন্তত একটি পদের মধ্যে উল্লিখিত [illegible] নাম দেখে বোঝা যায় এগুলি সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যে রচিত। ১২১০-৪৭ খ্রীঃ মধ্যে রচিত শার্ঙ্গদেবের 'সঙ্গীতরত্নাকর' নামক সঙ্গীতশাস্ত্রীয় গ্রন্থের প্রবন্ধ অধ্যায়ে দেখা যায় বিশেষ ছন্দ পদ্ধতিতে রচিত আধ্যাত্মিক সঙ্গীতকে চর্যা বলে। চর্যার সঙ্গীতশাস্ত্রীয় লক্ষণের সঙ্গে আমাদের আলোচ্য চর্যাগানগুলির আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে। এই প্রমাণের ভিত্তিতে অনুমিত হয় যে গানগুলির রচনাকালের সম্ভাব্য নিম্নসীমা মোটামুটি দ্বাদশ শতাব্দী।

সর্বসম্মত ভাবে চর্যার রচনাকাল ধরা হয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন — কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং বাংলা সাহিত্যে এর গুরুত্ব।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদের পর দীর্ঘ প্রায় আড়াইশো বছর বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টির কোনো নিদর্শন নেই। বাংলা দেশে তুর্কি বিজয় হল ত্রয়োদশ শতাব্দী আরম্ভ হতেই। বাংলার রাষ্ট্রীয় জীবনে হিন্দুর কর্তৃত্ব শেষ হল। মুসলমান রাজশক্তি সর্বতোভাবে প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা এবং সংস্কৃতির স্থিতি প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল প্রায় দুশ বছর। এই দুই শতাব্দীর বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস শাসনতন্ত্র ও গুপ্তহত্যা, রক্তপাত ও অনবরত যুদ্ধ এবং অত্যাচারী শাসনের উৎপীড়নে পূর্ণ। ফলে সেই অস্থির সময়ে সাহিত্যসৃষ্টির কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। অতঃপর মধ্যযুগীন ইলিয়াস শাহ স্বাধীন বংশ প্রবর্তন করলে সমাজ জীবনে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে আসে এবং নতুন করে সাহিত্য সৃষ্টির সম্ভাবনা ঘনিয়ে ওঠে — যার অন্যতম উল্লেখযোগ্য নিদর্শন — 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'।

বাংলা ভাষাতে সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটি দীর্ঘকাল অনাবিষ্কৃত ছিল। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে (১৯০৯ খ্রীঃ) শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রামে শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্র বংশধর দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গোয়ালঘরের মাচার উপর রাখা অব্যবহৃত পুঁথির মধ্যে থেকে এই গ্রন্থের পুঁথিটি আবিষ্কার করেন। ১৩২৩ বঙ্গাব্দে (১৯১৬ খ্রীঃ) তাঁরই সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ থেকে পুঁথিটি প্রকাশিত হয়। এর প্রথম, মধ্য ও শেষের দিকের কয়েকটি পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি বলে গ্রন্থের নাম ও কবি-পরিচিতি অজ্ঞাত থেকে গেছে। খণ্ডিত পদসহ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির অন্তর্গত পদের সংখ্যা ৪১৮। এই ৪১৮টি বাংলা পদ ছাড়া গ্রন্থের অন্তর্গত সংস্কৃত শ্লোকের সংখ্যা — ১৬১। প্রত্যেক বিভাগের এই গ্রন্থের প্রতিটি খণ্ডের সূচনায় সেই খণ্ডের নামনির্দেশ আছে পুঁথিতে। কিন্তু পুঁথি খণ্ডিত হওয়ায় 'জন্মখণ্ড' ও বৃন্দাবন খণ্ডের সূচনাংশে পাওয়া যায়নি। আর 'কালীয়দমন' ও হারখণ্ডের মধ্যবর্তী খণ্ডটির নাম পুঁথিতে লিপিকরের ভুলের জন্য জানতে পারা যায়নি।

গ্রন্থের ভণিতা থেকে জানা যায় — এর লেখক বড়ু চণ্ডীদাস। বইটির নাম দেওয়া হয় — 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। এই নামটি আদ্যপাতের অভাবে পুঁথির আবিষ্কর্তা-সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় নিজেই দিয়েছিলেন। এই নাম দেওয়া ঠিক হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন ডঃ বিমানবিহারী ভট্টাচার্য প্রমুখ কোনো কোনো গবেষক। চৈতন্য পূর্ববর্তী কালের কাব্যকে কীর্তন নামে পরিচিত করা কালানৌচিত্য দোষদুষ্ট বলে মনে হতে পারে। কীর্তন নামে পরিচিত বাংলা বাংলা সঙ্গীত পালার মধ্যে ভাব রস ও ভক্তিভাবের দিক থেকে এ গ্রন্থের মিল নেই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামটির বিরুদ্ধে এই যুক্তি। তাছাড়া পুঁথিটির মধ্যে প্রাপ্ত একটি হাতে লেখা রসিদ দেখে বোঝা যায় এই পুঁথিটি বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের সংগ্রহশালায় দীর্ঘকাল ছিল। 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' এই নামেই গ্রন্থটির পরিচয় দেওয়া হয়েছে উক্ত রসিদে। এই গ্রন্থটির নাম দেওয়া উচিত ছিল — 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' — শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নয়। তবে বইটি পঞ্চাশ বছরের বেশিদিন ধরে ঐ নামে পরিচিত হয়ে এসেছে। সে নামটি অপ্রামাণিক হলেও তার স্থানে নূতন নামের প্রচলন হওয়া কঠিন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষাকে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বিশেষ পরীক্ষা এবং গবেষণার পরে বাংলা ভাষার আদিমধ্যযুগের আদর্শরূপে গ্রহণ করেছেন। তাঁর Origin and Development of Bengali Language — নামক গ্রন্থে

তিনি প্রধানত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার উপরে ভিত্তি করেই আদি মধ্য বাংলার রূপ-কাঠামো নির্ণয় করেছেন। বাংলা ভাষার স্তর বিভাগে এই যুগের চিহ্নিত গ্রন্থের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সবচেয়ে প্রাচীন বলে বিবেচিত হতে পারে। ড: সুকুমার সেন তাঁর সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে বড়ু চণ্ডীদাসকে কখনও কখনও চৈতন্য যুগে স্থাপন করতে চেয়েছেন। কিন্তু শেষে তাঁর ভাষার উক্তিতে - বড়ু চণ্ডীদাসের ভাষাকে আদিমধ্য যুগের ভাষা বলে নির্দেশ করেছেন। তাঁর মত প্রাচীনত্ব এখন বিশেষজ্ঞের সমর্থনে সমর্থিত হয়নি। ভাষার বিচারে বড়ু চণ্ডীদাসের নিদর্শন প্রাচীন বলে ধরতে হবে। পাওয়া পুঁথির লিপি পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞগণ নানা মত ব্যক্ত করেছেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে পুঁথিটির লিপিকাল চতুর্দশ শতকীর শেষার্ধ। রাধাগোবিন্দ বসাকের বিচারে পঞ্চদশ শতকীর দ্বিতীয়ার্ধ, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির বিচারে অষ্টাদশ শতকীর দ্বিতীয়ার্ধ। কেবল লিপিকালের বিচারে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রচনাকাল সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নয়। সবদিক বিচার করে আলোচ্য কাব্যটিকে চৈতন্যপূর্বযুগে চতুর্দশ বা পঞ্চদশ শতকের রচনা বলে মনে করা হয়।

চৈতন্য পূর্বযুগে বাংলাদেশে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপ নয়, লোকজনময় কৃষ্ণের যে রূপ তা মাধুর্যমণ্ডিত। শুধু মাধুর্য মণ্ডিতই নয়, তাতে অন্যের ভক্তি, লীলাবিলাস, নিম্নরুচিত চরিত্র রূপ হয়ে উঠেছে। লোকসমাজে কৃষ্ণ রাধা ও গোপীদের প্রণয়ের বিচিত্র কাহিনী জনশ্রুতিরূপেই প্রচলিত ছিল। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' রাধাকৃষ্ণলীলার এই লৌকিক রূপটিই প্রতিফলিত। এই কাব্যের মূল চরিত্র তিনটি - কৃষ্ণ-রাধা এবং বড়ায়ি। তাছাড়া দেবকী, বসুদেব, কংস, যশোদা, নন্দ, আইহন ও আইহনের মা, বলভদ্র - প্রমুখ - প্রভৃতি কয়েকটির উপস্থিতি আছে। তবে রাধা-কৃষ্ণ ও বড়ায়ির উক্তি প্রত্যুক্তির মধ্যে সংলাপের মধ্যদিয়ে কাব্যকাহিনী পরিণতির দিকে এগিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ত্রয়োদশ খণ্ডের নাম — যথাক্রমে - 'জন্মখণ্ড', 'তাম্বুল খণ্ড', 'দানখণ্ড', 'নৌকাখণ্ড', 'ভারখণ্ড', 'ভারখণ্ডান্তর্গত ছত্রখণ্ড', 'বৃন্দাবনখণ্ড', 'যমুনান্তর্গত কালীয়দমনখণ্ড', 'যমুনান্তর্গত বস্ত্রহরণখণ্ড', 'যমুনান্তর্গত হারখণ্ড', 'বাণখণ্ড', 'বংশীখণ্ড' এবং 'রাধাবিরহ'। তবে কাহিনী ও চরিত্র যেভাবে অগ্রসর হয়েছে তাতে খণ্ড কাব্য হিসাবেই তা উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। আলোচ্য কাব্যের অংশবিশেষ হলেও কোন খণ্ড স্বয়ং সম্পূর্ণ পাঠ করলেও আস্বাদনযোগ্য।

কাব্যের কাহিনী নিম্নরূপ — জন্মখণ্ড ভূমিকাস্বরূপ - কৃষ্ণ রাধা - বড়ায়ি এই তিন চরিত্রের পরিচয় এবং খুব সংক্ষেপে কৃষ্ণাবতারের উদ্দেশ্য ও কংসনিধনের পৌরাণিক প্রসঙ্গ উপস্থাপন করা হয়েছে এখানেই। মূল কাহিনীর সূত্রপাত তাম্বুলখণ্ড থেকে। কৃষ্ণ রাধার দেহ কামনা করে তাম্বুল প্রেরণ করেছে বড়ায়ির মারফত। রাধা বড়ায়িকে চড় মেরেছে এবং কৃষ্ণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। পরবর্তী দুই খণ্ডে কৃষ্ণ যথাক্রমে দানী এবং মাঝি হয়ে রাধাকে মথুরা যাবার পথে জোর করে সম্ভোগ করেছে। ভারখণ্ড থেকে রাধা ও কৃষ্ণ বিষয়ে কিছুটা আসক্তি অনুভব করেছে, কৃষ্ণকে দিয়ে সে ভার বইয়েছে। ছত্রখণ্ডে রোদে ছাতা ধরিয়েছে। বৃন্দাবনখণ্ডে রাধাকৃষ্ণের মিলন পুলকিত উদ্যানে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অবশেষে বাণখণ্ডে কৃষ্ণ-নিক্ষিপ্ত সম্মোহন বাণে বিদ্ধ হয়ে রাধা সমাজ-সংসারের সব বাধা ভেঙে অপেক্ষায় কৃষ্ণকে খোঁজা দিয়েছে। বংশীখণ্ডে কৃষ্ণ হৃদয়ের বংশী হরণ - রাধার আর্তির প্রকাশ ঘটেছে, যোগে দেহ ও প্রতিশোধ বিকল্পে বাঁশি চুরি করেছে রাধা এবং কৃষ্ণ বাঁশি ফিরে পেয়ে রাধার আর্তি তেমন কিছুতেই মানেনি। 'আজিকেতে চন্দ্রাবলী এই লক্ষের দাসী' - রাধার এই আত্মনিবেদন কৃষ্ণের কানে কোনমতে পৌঁছায়নি। ফলে রাধাবিরহে - সম্পূর্ণ কৃষ্ণের পরিচয় পাওয়া যায়। সম্পূর্ণ বিরহিণী রাধাকে ফেলে মথুরায় চলে গেছেন কৃষ্ণ। রাধার বিরহ ক্রন্দনের মধ্যদিয়ে খণ্ডিত কাব্যটির কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

বাংলাসাহিত্যে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর গুরুত্ব :—

বাংলা সাহিত্যে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের আবিষ্কার একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই ঘটনাটি আবিষ্কারের ফলে সাহিত্যের ইতিহাসের যে জায়গাগুলিতে নতুন চিন্তাভাবনার ঝড় তুলে দিয়েছিল সেগুলি নিম্নরূপ –

(১) চণ্ডীদাস সমস্যা ।। চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদাবলী সংকলন পাঠক-শ্রোতা এবং সমালোচকেরা এতদিন আনন্দে এবং অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে গ্রহণ করে আসছিলেন। বড়ু চণ্ডীদাসের পুঁথিটি আবিষ্কারের ফলে সৃষ্টি হল অনভিপ্রেত চণ্ডীদাস নিয়ে সমস্যা। নতুন আবিষ্কৃত পুঁথিটি ভাবে ভাষায় এবং কাব্যাদর্শে চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীর সঙ্গে মিলল খুবই কম। দুইয়ের মধ্যে প্রেম-ভাবনায় এবং রসনিবেদন ভঙ্গিমারও স্বতন্ত্র হওয়ায়। (ক) সুকুমার সেন বলেছেন — "দুই কবির বোধে যে পার্থক্য তা দুই স্বতন্ত্র কবির — একে অপরের পরিণত রূপ — এরূপ অনুমান করার কোনো যুক্তি নেই।" (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস)। (খ) তবু দীনেশচন্দ্র সেন ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ অনেক বিশিষ্ট চিন্তাবিদ দুই চণ্ডীদাসের অভিন্নতা স্বীকার করে নিয়েছেন। এছাড়াও দীন চণ্ডীদাস এবং সহজিয়া চণ্ডীদাস নামেও কবির উল্লেখ পাওয়া যায়। এই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আবিষ্কারের ফলে যে চণ্ডীদাস সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল আজও তার নিশ্চিত কোন সমাধানসূত্র পাওয়া যায়নি।

(২) ভাষা ।। আদি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের যে সব নিদর্শন পাওয়া যায় তাতে বাংলা ভাষার সমকালীন রূপ রক্ষিত হয়নি। অতিপ্রচলনের জন্য কবিদের কাব্যের ভাষা ক্রমে পরিবর্তিত হয়েছে। আধুনিক হয়ে উঠেছে। পঞ্চদশ শতকের কোন লক্ষণই এর মধ্যে বর্তমান নেই। মালাধর বসুর কাব্যে ভাষাগত প্রাচীনতা সামান্যই রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু বড়ুর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনই একমাত্র গ্রন্থ যাকে আদি মধ্যযুগের বাংলা ভাষার নিশ্চিত নিদর্শন রূপে গ্রহণ করা যায়। চর্যাপদের পরবর্তী ভাষার বিবর্তিত রূপ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেই লভ্য। তাই ভাষাবিজ্ঞানীদের কাছে এ গ্রন্থের মূল্য অপরিসীম।

(৩) ঐতিহাসিক যোগসূত্র ।। জয়দেবে রবিবর্জিত বিশুদ্ধ পদসাহিত্য এবং লীলামূলক আখ্যানের মিলন ঘটেছিল। জয়দেবের সংস্কৃত কাব্যের সঙ্গে পরবর্তী বাংলা বৈষ্ণব পদাবলী এবং কৃষ্ণলীলা কাব্যের সম্পর্ক আবিষ্কার অনেকটা অনুমানসাপেক্ষ হয়ে পড়ত যদি না শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সাক্ষ্য পাওয়া যেত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এমন সাক্ষ্য লক্ষণ রয়েছে যাতে এই কাব্যটির ঐতিহাসিক সূত্রপথের অনুসরণ করা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে জয়দেবের কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ স্থান পেয়েছে। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল এর কাব্যাদর্শ এবং বিষয়বস্তুতে জয়দেবের প্রভাব। বড়ু চণ্ডীদাস কৃষ্ণকথা লিখতে গিয়ে ভাগবতের পথ ধরলেন না, জয়দেবের আদর্শ অনুসরণ করলেন। জয়দেবের মধ্যেই ছিল বাংলার নিজস্ব প্রীতি ও বিশ্বাসের যোগ। জয়দেবের সংস্কৃত কৃষ্ণলীলা কাব্যের সঙ্গে পরবর্তী বাংলা কৃষ্ণলীলা কাব্যের সম্বন্ধ রয়েছে। এই সম্বন্ধের সেতুবন্ধন হল শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে।

(৪) সংগীতরীতি ।। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্' কাব্যের মতো সংগীতের রীতি অনুসৃত আছে। আনুমানিক চতুর্দশ পঞ্চদশ শতকে রচিত আদি-মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যের একমাত্র নিদর্শন বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে। অবশ্য গীতগোবিন্দের তুলনায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে লৌকিক মাধুর্য বর্জিত। মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনই প্রথম নাট্যলক্ষণ ও গীতলক্ষণযুক্ত আখ্যানকাব্য।

⑥ পরবর্তীকালে প্রভাব ॥ বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ প্রথম বাংলায় আখ্যানকাব্য রচিত রাধাকৃষ্ণলীলাকে অবলম্বন করা হয়েছে। পরবর্তী কালের পদাবলীর ও অন্যান্য সংকলিত কাব্যের আদর্শ তৈরি করেছে। অন্যান্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পদাবলীকে বাদ দিলেও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' সংকলিত বিরহ, মিলন, অনুরাগ, অভিসারের মত 'লীলা রসপর্যায়' পদগুলির মধ্যে পরবর্তী যুগের বৈষ্ণব পদসাহিত্যের নিকট যোগসূত্র রয়েছে। আধুনিকত্বও আছে। কাহে-রুচে-বিরহে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য যে আছে তা অস্বীকার্য নয়। তথাপি বড়ুর আদর্শ পরবর্তী কবিরা অনুসরণ করেছিলেন নিঃসন্দেহে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণবদের অধিকারে স্থাপিত হওয়ায় বড়ুকে সরাসরি অনুসরণ করার প্রশ্ন ওঠেনা। কিন্তু বাংলায় রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ সাহিত্য এবং কাব্যের ইতিহাসটি এই পথ ধরেই চলেছে। বড়ুর মধ্যে পরবর্তীদের সমস্ত লোকরুচি ও লোকরুচির সবকিছুই অঙ্কুরাকারে সূচিত হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের গ্রাম্যতা, সে স্থূলরুচি ও আদিরসের আতিশয্য থাকলেও অশ্লেষ কৃষ্ণনারী-তে রাধাপ্রেম যেন মর্তলোক বিবর্তিত পাঁক থেকে স্থূলতার পথ থেকে পবিত্রপ্রেমের শতদলরূপে বিকশিত হয়েছে। রাধাপ্রেমের গভীরতা ও আর্তি যথার্থই জীবন্ত হয়েছে এখানে। তাই জনৈক সমালোচক যথার্থ মন্তব্য করেছেন — 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যেখানে শেষ, বৈষ্ণব-পদাবলীর শুরু সেখান থেকেই।'

সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

যোগাযোগ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

* রবীন্দ্র উপন্যাস সম্ভার

* রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস করুণা (১৮৭৭-১৮৭৮) -ভারতী- পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস	রচনাকাল	বিষয়
বৌঠাকুরাণীর হাট	১৮৮৩	
রাজর্ষি	১৮৮৭	
দ্বন্দ্বমূলক উপন্যাস		
চোখের বালি	১৯০৩	
নৌকাডুবি	১৯০৬	
যোগাযোগ	১৯২৯	
বৃহত্তর সমস্যামূলক উপন্যাস		
গোরা	১৯১০	
ঘরে বাইরে	১৯১৫	
চার অধ্যায়	১৯৩৪	
মিস্টিক বা রোমান্টিক		
চতুরঙ্গ	১৯১৬	
শেষের কবিতা	১৯২৯	
স্বল্প উপন্যাস		
দুই বোন	১৯৩৩	
মালঞ্চ	১৯৩৪	

* যোগাযোগ উপন্যাসটি বিচিত্রা পত্রিকায় আশ্বিন ১৩৩৪ সাল থেকে ১৩৩৫ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

* প্রথম দুই কিস্তিতে রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসের নাম

* ১৩৩৪ অগ্রহায়ণসংখ্যায় বিচিত্রা পত্রিকাতে রবীন্দ্রনাথ নামান্তর নামে কিস্তিতে লেখেন।

* যোগাযোগ উপন্যাসে সমসাময়িক কালে প্রকাশিত একটি উপন্যাসের নাম 'শেষের কবিতা' (১৯২৯)

* তিন পুরুষ নাম ঘুচিয়ে আমার গল্পের নাম দেওয়া গেল যোগাযোগ — এটা বলা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২৭ সালে কিন্তু নামান্তরের প্রসঙ্গের মধ্যে বলেন।

(১ম)

* যোগাযোগ উপন্যাসে উল্লেখিত দুটি পরিবারের নাম হল — ঘোষাল ও চাটুজ্যে পরিবার।

* উপন্যাসের প্রথম লাইন — আজ ৭ই আষাঢ়। অবিনাশ ঘোষালের জন্মদিন।

* অবিনাশ ঘোষালের বয়স কত?

⇒ ৩২ বছর।

* ঘোষালরা প্রথমে কোথায় থাকত?

⇒ সুন্দর বনের দিকে, (তৎকালীন) হুগলী জেলার নূরনগরে।

* ঘোষালদের আগেকার গ্রাম কোথায় ছিল?

⇒ শেয়াকুলিতে। (সেখানে ঘোষাল দিঘি আছে)

* ঘোষালদের বর্তমান বসতি কোথায়?

⇒ ঘোষালদের বর্তমান বসতি রজবপুরে এবং কলকাতায়।

* চাটুজ্যে জমিদারদের সঙ্গে ঘোষালদের কী নিয়ে খিটিমিটি বাধে?

⇒ দেবতার পূজা নিয়ে। ঘোষালরা চাটুজ্যেদের চেয়ে দুহাত লম্বা প্রতিমা বানিয়েছিল।

* যে মামলা থামল ঘোষালদের সর্বনাশের কিনারায় এসে — এখানে কোন মামলার কথা বলা হয়েছে?

⇒ ঘোষালদের দুহাত লম্বা প্রতিমা দেখে নিমন্ত্রিতের গাঁসুদ্ধ সবাই চাটুজ্যেরা রেগে মেগে জোট ...

তারই কথায়: তখন ঘোষালরা আদায় প্রতিমার মাথা ভাঙার ভয়ে সব তোরই দাও উঠে গেলে; খুনাখুনি হয়ে গেল মামলা মোকদ্দমা পর্যন্ত গড়াই।

* চাটুজ্যেরা ঘোষালদের কিসের সামাজিক অপবাদ দেয়?
=> ঘোষালেরা হল ডাকাত, খুনে, এখানে আম দেবীর চরণে দিয়েছে, অর্থাৎ কেবল দেবীকে রক্ত দিয়েছে।

* সে গল্প আর একশো বছর ধরে ঘোষালদের ঘরে চলে আসছে — এখানে কোন গল্পের কথা বলা হয়েছে?
=> চাটুজ্যেদের নিযুক্ত দস্যুসর্দার আচার্য ঘোষালদের বাড়িতে খুন করে দেয়, এখানে সেই গল্পের কথা বলা হয়েছে।

* দস্যু সর্দারের কি পরিণতি হয়েছিল বলে মনে হয়?
=> ঘোষালদের লাঠিয়ালের হাতে দস্যুকে খুন করে লাশ গুম করা হয়।

* ঘোষালদের নায়েব কে ছিল?
=> ~~অনিরুদ্ধ ঘোষাল~~, বিশ্বস্ত ঠাকুরদা নিজের বাবা।

* অনিরুদ্ধের ছেলের নাম কী ছিল?
=> মধুসূদন ঘোষাল।

(২য়)

* মধুসূদনের বাবার নাম কী? সে কী কাজ করত?
=> আনন্দ ঘোষাল। হরিনপুরের জমিদারদের মুহুরিগিরি করত।

* মধুসূদনরা ক'ভাই ছিল? তার প্রথম শিক্ষা কোথায় হয়?
=> চার ভাই ছিল। অবৈতনিক স্কুলে।

* এরা পূর্বপুরুষেরা বড়ো বড়ো সওদাগরের মুৎসুদ্দিগিরি করে এসেছে? — কার কথা বলা হয়েছে?
=> মধুসূদনের বড়ো দাদাই মুৎসুদ্দির কথা বলা হয়েছে।

* কে মধুসূদনকে সওদাগরের আপিসে বসিয়ে দেন?
=> বড়ো দাদাই মুৎসুদ্দির কাছে তদবীর করে মধুসূদনকে সওদাগরের আপিসে বসিয়ে দেয়।

* মধুসূদনের কাজের পেছনে শিক্ষালয়ের কিসের দোষ ছিল? কোম্পানি কে দিয়েছিল?
=> মধুসূদন। নামটি তার পূর্বতন অনুগত অধ্যাপকের দেওয়া।

[illegible]

*উপন্যাসটিতে দাম্পত্য সংকট আলোচনা কর।

⇒ যোগাযোগ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয় হল মধুসূদন ও কুমুদিনীর দাম্পত্য সংকট। এই দাম্পত্য দ্বন্দ্ব বিয়ের রাত থেকে নানা ভাবে শক্তির প্রতিযোগিতা চলেছে অনেক ~~[illegible]~~ দিক থেকে নির্ধারিত। ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ কুমু বিবাহের পর মুহূর্ত থেকে ~~[illegible]~~ দাদার বিপ্রদাস স্নেহ সান্নিধ্যে বঞ্চিত হয়েছে। কিন্তু মধুসূদনের স্বামীত্বের সঙ্গে আভিজাত্যে তাঁর মানসিক বিরোধ ঘটেছে। কুমু এই সংকটের দিনে দেখতে পেয়েছিল মোতির মাকে। → এরপর য মোতির মা চরিত্রের প্রসঙ্গ।

অন্যদিকে নবীনের সারল্য ও ধৈর্য, সহযোগিতা কুমুকে এক অনাস্বাদিত মানসিক আনন্দে ভরিয়ে তুলেছিল। কুমুর মানসিক সৌন্দর্যকে মধুসূদন চিনতে না পারলেও বুদ্ধিমান নবীন চিনে নিয়েছেন। দাদা মধুসূদন সম্পর্কে তাঁকে বলতে শুনি - "এমন বউ ঘরে পেয়েছি যে ঘরে তাকে নিতে হয়, রাখতে হয়, ও দাদা কুমুকে না- সমস্ত নষ্ট করে দিলে।" সংসারে সকলে তাকে উন্মাদ বলেছিলেন। কিন্তু মধুসূদনের সামনে স্পষ্ট ভাষায় নিজের মতামত প্রকাশের সাহস একমাত্র নবীনের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। মধুসূদনকে না জানিয়ে কুমুকে তার দাদার চিঠি এনে দিয়েছে সে। এইকারণে মধুসূদন তাকে জেরা করলে সে স্পষ্টভাষায় বলে - "তিনি তো এই বাড়ির বউ; কেমন করে মানব তাঁর হুকুম এখানে চলবে না? --- তিনি তো আমার মনিব নন তিনি আমার গুরুজন, তাঁকে যে মানব সে নিমক খেয়ে নয়, সে আমার ভক্তি থেকে।

মধুসূদন একসময় মনে করতে থাকেন যে, কুমুর স্বামী বিমুখতার পিছনে আছে নবীন ও মোতির মার কারসাজি। তখন সাহসী-নবীন দাদার মুখের উপর বলে উঠেছে — "বড়বউরানীকে ভোলাবার মন্ত্র সংসারে আর কারো দরকার হয় না - তুমি একাই পারবে।"

মধুসূদনের রোষ থেকে কুমুকে বাঁচাতে, দাদার মনকে শান্ত করার জন্য নবীনের চেষ্টার অন্ত ছিল না। সকল ভেঙেই স্বামীর ঘরে তাই দাদার কে নিয়ে গিয়েছে। সেখানে মধুসূদন জানতে পেরেছেন তাঁর ঘরে লক্ষ্মীর আবির্ভাব ঘটেছে নতুন কুমুকে আশ্রয় করে। আর লক্ষ্মী যদি মানসিক আঘাত পান তাহলে দুর্লভ হবেন। এর পরই কুমুর প্রতি মধুসূদনের মানসিক আচরণ পাল্টে গেছে। তাঁকে বলতে শোনা ~~[illegible]~~ গেছে - "বড়োবউ তুমি এসেছ আমার ঘরে নতুন থেকে অনেক। তাঁকে বলতে শোনা গেছে - অনেক সয়েছে।"

* "আমার মতের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবি তুই? তোর সামনে হাতজোড় করে দিন রাতে হাঁ করে থাকতে হবে?"— কে, কাকে? কোন প্রসঙ্গে একথা বলা হয়েছে আলোচনা কর।

⇒ উদ্ধৃতাংশটির বক্তা 'যোগাযোগ' উপন্যাসের বিপ্রদাস। তিনি তাঁর বোন কুমুদিনীকে একথা বলেছেন।

বিপ্রদাসের যখন আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ, মহাজন টাকার জন্যে নালিশ করছে, উদ্ধার পাওয়ার রাস্তা নেই, তখন মুকুন্দ বিলেত থেকে চিঠি লিখেছে 'খুবই দরকার — জরুরি দরকার'। এত টাকা কোথা থেকে দেওয়া যাবে ভেবে না পেয়ে বিপ্রদাস যখন চিন্তিত, তখন বিমূঢ় অবস্থা হয়ে কুমুদিনী মায়ের গয়নাগুলো বিক্রির কথা — যা কুমু কুমুদিনীর বিয়ের জন্য তোলা ছিল; সেগুলি বেচে বিপ্রদাসকে দিতে চেয়েছে। কুমুদিনীর দাদা অন্তপ্রাণ। সেই দাদা উদ্বেগে, দুশ্চিন্তায় রাত জাগবেন আর সে গয়নাগুলো অধিকার করে বসে থাকবে, এমন স্বার্থপর কি কুমু হতে পারে। কিন্তু বিপ্রদাস কুমুর গয়না কিছুতেই নিতে চায় না। ভাইয়ের প্রয়োজন মেটাতে বোনের ~~সম্পদ~~ ভবিষ্যতে অন্ধকারের মধ্যে ঠেলে দেবে এমন নির্বোধ সে নয়। কুমু ~~বার~~ বারবার জোর করতে থাকলে বিপ্রদাস উদ্ধৃত উক্তিটি করেছেন। উক্তির মধ্যে বিপ্রদাসের চিন্তার ও সিদ্ধান্তের স্বাধীনতা প্রীতি এবং বোনের প্রতি স্নেহমূলক কর্তব্য বোধ প্রকাশ পেয়েছে।

* আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি, এ সম্বন্ধ হয়েই গেছে, এ প্রজাপতির নির্বন্ধ।

⇒ উদ্ধৃতাংশটির বক্তা নীলমণি ঘটক — গঙ্গামণি ঘটকের পুত্র।

এখানে মধুসূদন ঘোষালের সঙ্গে বিপ্রদাস চাটুজ্জের বোন কুমুদিনীর বিবাহ সম্বন্ধের কথা বলা হয়েছে।

উপন্যাসে ~~নীলমণি~~ নীলমণি ঘটক একটি টাইপ চরিত্র। এর মধ্যে অভিনব কোন বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা লেখক করেননি। যেমনটা না হলে নয় তেমনটা এঁকেছেন। ঘটকালি যাদের পেশা, তাদের বেশি কথা যেমন বলতে হয়, তেমনি অনেক মিথ্যার আশ্রয়ও নিতে হয়। বিপ্রদাসের কাছে প্রথমবার এসে আত্মপরিচয় দেবার সময় বলেছে, "আজ্ঞে কর্তারা আমাকে খুবই চিনতেন, আপনারা তখন শিশু।" কথাটি যে মিথ্যা তা লেখক জানিয়ে দিয়েছেন। 'ঘটক যে পাত্র পাত্রী সন্ধান আনে তা' কোনো মন্দ হয় না।' যেকোন ভাবেই তার গুনাগুন প্রতিষ্ঠা করতেই তারা ব্যস্ত হয়ে ওঠে। অভিভাবকদের প্রভাবিত করার সুযোগটি সম্পন্ন করতে পারলেই তার 'ঘটক বিদায়' ~~বা~~ বাবদ কিছু প্রাপ্তি হয়। তাই হাল ছাড়তে সহজে রাজি হয় না। কুষ্ঠির অদ্ভুত মিলের কথা বলে, কুলতালীর সম্মান পাওয়ার কথা বলে বিবাহ ঘটিয়ে দিয়েছে। এই বিবাহের ফলেই দুই পরিবারের পুরানো সমস্যার প্রেক্ষাপটে নতুন সমস্যার বীজ উপ্ত হয়।

* যোগাযোগ উপন্যাসকে অবলম্বন করে কুমু ও মধুসূদনের দাম্পত্য প্রেমের সংকট উদ্ঘাটন কর।

উঃ "চোখের আঁখি দিয়ে আঁকি মনের মত হয় না
কামনা তা দুই মনকেই দুই মনমন রয় না"

স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য প্রেম টিকে থাকে দুই মন অবিমিশ্রতা বা মনের মিলের উপর। —"যদিদং হৃদয়ং মম তদিদং হৃদয়ং তব" - এ মন্ত্র স্বামী স্ত্রীর পথ চলার পাথেয়। কিন্তু যোগাযোগ উপন্যাসে চাটুজ্যে ও ঘোষাল বংশের পারিবারিক বিদ্বেষের বলি হয়েছেন কুমুদিনী। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে—'ট্রয় যুদ্ধের পর তুষিত প্রেতাত্মাকে তুষ্ট করার জন্য অ্যাকিলিসের সমাধিতে ঢেলে দেওয়া হয়েছিল প্রিয়াম কন্যা পলিক্সেনার শোণিত ধারা।' ঠিক তেমনি ঘোষাল ও চাটুজ্যে বংশের বিরোধের অবসানে ঘটেছে কুমুর আত্মবলিদানে।

প্রতিশোধস্পৃহা

প্রতিশোধ মত্ত মধুসূদন অতীতের চাটুজ্যে বংশের অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য সেই বংশের কন্যা কুমুদিনীকে বিবাহ করে অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়েছে। ঋণের ফাঁদ ফাঁদে জড়িয়ে দিয়েছে চাটুজ্যেদের জমিদারকে। আর মধুসূদন ও কুমুদিনীর দাম্পত্য জীবনেও এই প্রতিশোধস্পৃহা ঘনিয়ে তুলেছে সংকটের কালো আবর্ত।

বিবাহ সার্থক হয়নি

সামাজিক বিবাহের স্বাভাবিকতাকে মেনে নিয়েই মধুসূদন আর কুমুদিনী পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু তারা বিভিন্ন প্রকৃতির অধিকারী, তাদের জীবনের রুচিবোধ সমান্তরাল সরলরেখার মত কিন্তু অভিসারী নয়। একদিকে মধুসূদন - ধনতান্ত্রিক ধনিয়ান কালচার আর ব্যবসায়িক বুদ্ধিতে স্বচ্ছন্দ্য, অন্যদিকে কুমুদিনী - সামন্ততান্ত্রিক আভিজাত্য আর সাংস্কৃতিক চেতনায় সমুজ্জ্বল। মধুসূদন অসংস্কৃত। কুমুকে তাই সে কামনা নিবৃত্তির যন্ত্র হিসাবে দেখেছে। তার চরিত্র রূঢ় কঠিন, দাম্ভিকতা ও প্রভুত্বের বর্মে আচ্ছাদিত। অন্যদিকে কুমুদিনীর স্বভাব [redacted] যেমন রমণীয়, সৌন্দর্য কমনীয়, আত্মসত্তা বোধ ও তেমনি মোহনীয়। লেখকের মতে — "ভোরের শুকতারার মতো, রাত্রির দিক থেকে স্বতন্ত্র, প্রভাতের জগতের উপরে।"

প্রেম গন্ধ নাহি তায়

সত্যানুরাগী কুমুদিনীর কাছে স্বামী স্ত্রীর মিলন সর্বার্থে নিছক জৈবিক সম্পর্ক নয়। বরং আত্মিক [redacted] মিলনের [illegible]

– 'কামগন্ধ নাহি তায়।' তার কামনা "পিতা যেমন করে পুত্রকে, সখা যেমন করে সখাকে, প্রিয় যেমন করে প্রিয়াকে সহ্য করতে পারে, হে দেব তুমিও যেন আমাকে তেমনি করে সহিতে পারো।" তবে কুমুর শিক্ষা হল নিজেকে নিবেদনের শিক্ষা। তবে আত্মসমর্পণ নেই, আছে একক অন্তরের পরিবর্তন। যেখানে স্বামী বলতে বোঝায় একটা Idea বা স্ত্রী সতীত্ব গৌরব প্রকাশের উপলক্ষ্য মাত্র।

কুমুর রহস্যাবৃত বৃত্তি

মধুসূদন কুমুর মনকে বুঝতে চেয়ে যতই কাছে পৌঁছে এসেছে ততই সে প্রেমাদর্শের চাদর গায়ে দিয়ে নিজেকে আরো বেশি অচেনা ও রহস্যাবৃতা করে তুলেছে। প্রথম দিকে কুমুর আত্মসমর্পণ যেটা মধুসূদনের কাছে 'সুর মগারী নয়' মনে হলেও পরে মধুসূদন অনুতপ্ত হয়েছে। অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ হয়ে সে শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর হাতে আংটি পরিয়ে দেয়, যাতে তুষ্ট হয়, নীলার আংটি খুলে দেওয়ার জন্য ক্ষমা চায়। আর বিপ্রদাসের দেওয়া এস্রাজ কুমুর হাতে তুলে দিয়ে বাজনা শোনানোর জন্য আবেদন জানায়। মধুসূদনের এই সব ক্রিয়াকলাপের মধ্যে কামগন্ধ কোথায়?

মধুসূদনের আদিম প্রবৃত্তির উন্মোচন

বেনিয়ান কালচারের প্রতিভূ মধুসূদনের কাছে বিয়ের সূত্রে প্রাপ্ত নারী হাতের গচ্ছিত টাকার মতোই অলংকারের সামগ্রী। তাই মধুসূদনের ও কুমুদিনীর সম্পর্কে দাঁড়িয়েছে খাদ্য খাদকের – "একটা অহংমা জন্তু লালায়িত রসনা মেলে গুঁড়ি মেরে বসে আছে।" মধুসূদনের দেহসম্ভোগের প্রচেষ্টাকে ~~মধুসূদন~~ কুমু নীরবতায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে আস্তাকুঁড়ে। আর মধুসূদন তার প্রভুত্বের অহংকার নিয়ে আদিম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করেছে শ্যামাসুন্দরীর স্থূল মাংসস্তূপে। একজনের মনহীন শরীর সম্ভোগের বাসনা আর অন্যজনের আত্মাভিমানী জীবনবোধ দুজনের ও প্রত্যাখ্যানে দাম্পত্য সংকটকে ঘনীভূত করেছে।

[মূল্যায়ন]

যোগাযোগ উপন্যাসে মধু-কুমুর দাম্পত্য সমস্যার বিপ্রতীপে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন নবীন ও মোতির মায়ের সুখী দাম্পত্য জীবন টিকে আছে মানিয়ে নেওয়া আর মেনে [illegible] নেওয়ার মানসিকতার উপর। সংসারের টুকরো আনন্দ নিয়ে নবীন যেমন সহজ সুন্দর দাম্পত্য জীবন যাপন করছে, তেমনি নিস্তারিণীও নিজের নাম হারিয়ে মোতির মার পরিচয় নিয়েই সংসারে শান্তি খুঁজেছে।

এই আত্মত্যাগ মধুসূদনও কুমুদিনীর মধ্যে নেই। অন্যতম ভাবেই মধুসূদনও চেয়ে গেছে পতিব্রতার সেবা নিয়ত। তাদের শারীরিক মিলন সম্ভব হলেও মানসিক মিলন সম্ভব হয়নি। নর্ম সহচরী রূপে কাছে পেলেও মর্ম সহচারী রূপে কুমুদিনী মধুসূদনের কাছে চিরকাল রহস্যময় নারীর মতোই অধরা থেকে গেছে।

রাজকণ্ঠের মণিমালা – অন্নদামঙ্গল॥

"রাজা আসে যায় রাজা বদলায়
নীলজামা গায় লালজামা গায়
এই রাজা আসে ওই রাজা যায়"
জামা কাপড়ের রঙ বদলায়, দিন বদলায় না — বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রাজসভা কবিদের। রাজসভার কুটিল চক্রান্তের অংশে জড়িত হয়ে রাজসভার কবিদের কখনো উঠতে হয় সৌভাগ্যের উদয় শিখরে, কখনো নামতে হয় অন্ধকার কারাগৃহে অথবা অতল মৃত্যুগহ্বরে। এলিজাবেথিয়ান যুগের - স্পেন্সার, ফিলিপ সিডনি, র‍্যালে কিংবা এদেশের - কালিদাস - বানভট্ট - জয়দেব - বিদ্যাপতি - মালাধর বসু - কৃত্তিবাস - দৌলত কাজী এবং ভারতচন্দ্র প্রমুখ সকল সভাকবির জীবন-ই রাজনিয়ন্ত্রিত। রাজসভার ঐশ্বর্য সম্পদ, সন্দেহ - ঈর্ষা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা - প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিলাস-ব্যসন, কামিনী কাঞ্চন, নাগরিক আচার আচরণ, মার্জিত আদব কায়দা ও স্তুতি-নিন্দা সবকিছু মিলিয়ে রাজসভা একটি সম্পূর্ণ - স্বতন্ত্র একটি জীবনচর্চার অধিকারী। যে রাজকীয় আভিজাত্যের চশমার মধ্যদিয়ে কবির জীবনদৃষ্টি প্রসারিত সেই আভিজাত্যের অনুভবিতা ও মাহাত্ম্যের উপর নির্ভর করে রাজসভার কবির প্রতিভা। প্রেম - যুদ্ধ ও রোমান্স - এই তিনে রাজা ও সভাসদদের আগ্রহ, আর সভাকবিগণ পাণ্ডিত্যের দীপ্তি ও অসাধারণ কলার চাতুর্যে, ভাব - ছন্দ - অলংকারের চমৎকারিত্বে - রাজন্যবর্গের মনোমত করে তোলেন তাঁদের সৃষ্টিকে।

কালিদাসের 'কুমারসম্ভবের' দেবায়ত প্রেমের মহিমা-রচনায়, রঘুবংশের বিস্তৃত রাজন্য প্রশস্তির মধ্যে এবং মেঘদূতের বিরহকে উপলক্ষ করে অভিজাত নাগরিক প্রেমচর্চার ব্যাপারে সভাকাব্যের চিরকালের বিষয়গুলির সন্ধান মেলে। হালের 'গাথাসপ্তশতী' থেকে জয়দেবের গীতগোবিন্দ - সবক্ষেত্রেই শৃঙ্গার রসের আধিক্য। বিদ্যাপতির রাধা-কৃষ্ণবিষয়ক পদাবলীও বৈষ্ণব ভাবুকতা নির্ভর সৃষ্টি নয়; রাজমনোরঞ্জন উপলক্ষে সর্বোপযোগী বিলাস কলার চর্চা। রাজকীয় আভিজাত্যে চেতনা লালিত শেষ কবি ভারতচন্দ্র, এক সার্বিক নিরাপত্তাহীনতার যুগে - অষ্টাদশ শতকে যাঁর আবির্ভাব। যখন বর্গীরা - "লুটি বাঙ্গালার লোকে করিল কাঙ্গাল।" (মহারাষ্ট্রপুরাণ) ("বর্গীর হাঙ্গামা, প্রজাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ, মহাবৎজঙ্গের হাতে লাঞ্ছনা - এসব সত্ত্বেও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র লোকের উপর নিশ্চিন্তই ছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি কিছু অনিশ্চয়তার কারণ ঘটেছে" (অমাবস্যার গান - নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়)) আর এসময়ই কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় ভারতচন্দ্রের সভাকবি হওয়ার পথ সফল হল। তাঁরই অনুরোধে লিখলেন 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য।

কিন্তু রাজমনোরঞ্জনের জন্য যে কাব্য লিখলেন ভারতচন্দ্র তা মহারাজের মনঃপুত হয়নি, কারণ তাতে "রস নেই, রসের শ্রেষ্ঠ আদি রস, তাই যদি না থাকে, তা হলে চণ্ডীর গীত লেখা হতে পারে, কিন্তু কাব্য হয় না" (অমাবস্যার গান) যে অন্তরভক্তি নিয়ে অন্নপূর্ণার মহিমা বন্দনা রচনা করতে চেয়েছিলেন - সেই মন নিয়ে দেশের লোকের ইতর রুচির উপাসনা করতে হবে। রাজসভার রুচি তাঁকে পিছনে নিয়ন্ত্রিত করেছিল যে সম্পর্কে কোন স্পষ্ট স্বীকারোক্তি তাঁর কাব্যে নেই। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর পোষ্টা এবং তিনি ও তাঁর পারিষদেরা তাঁর কাব্যসৃষ্টির সতর্ক শ্রোতা; তাই ভারতচন্দ্রকে সচেতন থাকতে হয়েছে। তাই সভাকবির গুণ হিসাবে তাঁর কাব্যে - শ্রেণিগত সৌন্দর্যচেতনা, মননশীল ছন্দঃবৈদগ্ধ্য, মার্জিত বাচনভঙ্গী, আলংকারিক ঝকমকে নৈপুণ্যের এবং শব্দ ধ্বনি বর্ণ কৌতুকের যেমন অদ্ভুত পরিচয় মেলে তেমনি রাজসভা কবির দোষরূপে এ কাব্যের মধ্যে দেখা দিয়েছে প্রেমেরক্ষেত্রে আত্মসর্বস্বতা, নাগরিক লঘু চটুলতা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দেহলোলুপতা, অভিমানী কোবিদতা এবং ইঙ্গিতপূর্ণ অশ্লীলতা। "ভক্তের মনোরঞ্জন করতে গেলে সরস্বতীর বরপুত্রও যে ষট্‌-রিপুর দলভুক্ত হয়ে পড়েন, তার দৃষ্টান্ত সমানে দুর্লভ। ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের মনোরঞ্জন করতে বাধ্য না হলে - তিনি বিদ্যাসুন্দর রচনা করতেন না, কিন্তু তাঁর হাতে বিদ্যা ও সুন্দরের অপূর্ব মিলনে সংঘটিত হত; যেমন Knowledge এবং Art

উৎসই তাঁর সম্পূর্ণ অনায়ত্ত ছিল। (প্রমথ চৌধুরী – 'সাহিত্যে খেলা')।

"ভারতচন্দ্রের প্রধান আকর্ষণ তাঁর স্টাইল" (কাব্যজিজ্ঞাসা – অতুলচন্দ্র গুপ্ত) অলঙ্কার শাস্ত্রানুসারে এই স্টাইল হল কাব্যের অবয়ব সংস্থান। সুবিন্যস্ততা বিষয়ে বলতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেছেন – "চরিত্র, রূপ, স্থান, অবস্থা, কার্য্য, এ সকলের সমবায়ে যাহা দাঁড়াইল, তাহা যদি সুন্দর হইল, তবেই কবি সিদ্ধিলাভ হইলেন।... অতএব সৌন্দর্য্য সৃষ্টিই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।" [উত্তরচরিত] – নূতন স্টাইলের রূপস্রষ্টা আত্মসচেতন নাগরিক মনন ঋদ্ধ ভারতচন্দ্রের কবিতে ও শর্ত-পালনে ছিল অনুরাগী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন না – যে কবিতার দেহের সৌন্দর্য নেই তার আত্মার সৌন্দর্য আছে। তিনি শুধু সার্থক কবি প্রতিভার অধিকারীই নন, তিনি একজন রূপমুগ্ধ নিপুণ শিল্পী। রূপনির্মিতিতে – শব্দচয়নে, ভাষাব্যবহারে, ছন্দভঙ্গিতে, অলংকার নির্মাণে তিনি যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা সমগ্র মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ব্যতিক্রম।

অলঙ্কার শাস্ত্র মতে কাব্যের লক্ষ্য হল রস। আলঙ্কারিকদের মত শিরোধার্য করেই ভারতচন্দ্র বলেছেন – "যে হোক সে হোক ভাষা কাব্য রস লয়ে" কিংবা "রসিকের স্থানে হয় রসের বিস্তার" – যুক্ত ভাষা ব্যবহারের নিপুণতাই তাঁর নিজস্ব স্টাইলকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে আধুনিক বাংলা ভাষার জনক বলেছেন। মোহিতলাল মজুমদার যথার্থ মন্তব্য করেছেন – "ভারতচন্দ্র বাংলা ভাষার প্রথম সাহিত্য শিল্পী।.... ভারতচন্দ্রের পূর্বে বাংলায় গান ছিল, গানের উপযুক্ত ভাষাও ছিল; কিন্তু এমন কাব্যও ছিল না, কাব্যের উপযুক্ত ভাষাও ছিল না।" ('বাংলা কবিতার ছন্দ')। 'ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক। অলঙ্কার সঙ্গীত শাস্ত্রের অধ্যাপক' – ভারতচন্দ্র নিজেই বলেছেন – "পড়িয়াছি সেই মত বর্ণিবারে পারি। কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি॥" অজস্র পাণ্ডিত্য প্রকাশ করে কাব্যকে দুর্বোধ্য করতে চাননি ভারতচন্দ্র। কাব্যকে সুষম রেখেও তাঁর বহুমুখী পাণ্ডিত্যের দীপ্তি নানা স্থানে প্রকাশ পেয়েছে, 'বিপুল শব্দভাণ্ডারের' মাধ্যমে তিনি বাংলা কাব্যকে অপূর্ব শিল্পসুষমায় মণ্ডিত করেছেন।

বাংলা-সংস্কৃত-আরবী-ফার্সী প্রভৃতি ভাষার সচেতন এবং যথাযথ প্রয়োগে তাঁর কাব্য সৌন্দর্যমণ্ডিত। দেববন্দনা অংশে ভারতচন্দ্র শুধু সংস্কৃতানুসারী তৎসম শব্দ প্রয়োগ করেছেন –

"গণেশায় নমো নমঃ আদিব্রহ্ম নিরুপম
পরমপুরুষ পরাৎপর।" (গণেশবন্দনা)

তৎসম শব্দ বহুল নারদের গান অংশে সত্যবিনের পদে সর্বত্র 'ই'-কারের ব্যবহার কবির সচেতনতার সপক্ষে সবচেয়ে বড় প্রমাণ। ভারতচন্দ্র অনায়াসে ভাষাবিদ এবং শব্দসিদ্ধ কবি। ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহারে তাঁর অসাধারণ পারদর্শিতা –

"লটাপট জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা
ছলচ্ছল টলট্টল কলক্কল তরঙ্গা" –

এখানে গঙ্গার প্রবহমানতা, নির্মলতা এবং গতিচ্ছন্দ জীবন্ত রূপ পেয়েছে, আবার ঈশ্বরী পাটনীর কথোপকথনে সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত আটপৌরে শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় –

"আধ আধ যদি মোর অঙ্গে মিলাইয়া।
কুচনীর বাড়ী তবে কেমনে যাইবা॥"

নারীগণের পতিনিন্দা অংশে দেশী শব্দের আধিক্য –

"সেই মাগ্য বুড়া বর হইল লেংটা।
আই মা লো কেমে রৈল ফেলিয়া ঘোমটা।"

'যাবনী মিশাল' ভাষা প্রয়োগের উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে 'অন্নদামঙ্গলের' তৃতীয়খণ্ডে — "পাতশা কহেন শুন মানসিংহ রায়।
গজব করিলা তুমি আমের জবায়॥"

"বর্ণভোজার সর্বশ্রেষ্ঠ শব্দশিল্পী" (বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস — আশুতোষ ভট্টাচার্য) — ভারতচন্দ্র শব্দনির্বাচনে বিশেষভাবেই গুরুত্ব দিয়েছেন। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন 'ভাষার ~~অপূর্ব~~ তাজমহল'। রাজসভার কাব্যের উপযোগী নাগরিক মার্জিত কলাবৈদগ্ধ্য ভারতচন্দ্রের বাণীশিল্পে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তাঁর কাব্যে বুদ্ধির ঝলক, বর্ণের 'দ্যুতি', শাণিত দীপ্তি এবং অলংকারের মণ্ডন কৌশলই প্রধান।

ভারতচন্দ্রের সচেতন সমাজ অভিজ্ঞতা বাংলা ভাষাকে এমন কিছু সংস্কৃত বাক্যবন্ধের জন্ম দিয়েছে যা প্রবাদ প্রবচনের মর্যাদা লাভ করেছে। (শিক্ষিত সমাজের অভিজ্ঞতার নির্যাস বা লোক চরিত্রজ্ঞানের প্রতিফলন হিসাবে এই সব প্রবাদগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ)—

① ধর্মে হানি সুখ হয় / তবু মনে নাহি রয়।
② বুড়া বয়সের ধর্ম অল্পে হয় রাগ।
③ যুবতীর মন সজনী জীবন।
④ মরম ধরম গেল উদরের লেগে।
⑤ যার কর্ম তারে সাজে / অন্য লোকে লাঠি বাজে।
⑥ ঘরে অন্ন নাহি যার সকল অলংকার।
⑦ মিছা বাণী সিঁচা পানি কতক্ষণ রয়।
⑧ বাপের বিক্রম যম ভাতের ভিখারী।
⑨ মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।
⑩ নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।

প্রবাদ — 'a Short Sentence based on long experience' — ভারতচন্দ্রের নাগরসমাজ অভিজ্ঞতা ও সুখজীবন বোধের পরিচয় এই প্রবাদগুলির মধ্যে ধরা পড়ে।

ছন্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রেও ভারতচন্দ্র অতিক্রান্ত শিল্পী। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের পয়ার ত্রিপদীর রাজ্যে ভারতচন্দ্র সংস্কৃত ছন্দরীতিকে আমন্ত্রণ জানিয়ে একদিকে যেমন তাঁর কুশলতার পরিচয় রেখেছেন, অন্যদিকে তেমনি বিষয় ও উচ্চারণের সঙ্গে সংগতি রেখে ছন্দব্যবহারের ক্ষেত্রটিকে প্রসারিত করেছেন। সংস্কৃতছন্দের বর্ণবিন্যাস কৌশল রেখে ও বাংলা ছন্দের বিশিষ্ট মতিপাতের ধরনকে বাঁচিয়ে খেলা যায় — এ মত তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। যার প্রতিফলন ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দের ব্যবহারে—

"ঝুলন্তী সতী হাতে কাঁধে জটারতী দে।
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে॥"

অথবা —

ভুজঙ্গপ্রয়াত:— "অরে রে মহারুদ্র ডাকে জটী রে।
অরে রে রে অরে দক্ষ দে রে সতী রে॥"

— দ্বাদশ অক্ষর বিশিষ্ট এই ছন্দের ১, ৪, ৭, ১০ সংখ্যক বর্ণ লঘু (১) অন্যগুলি গুরু বর্ণ। ভারতচন্দ্র সংস্কৃতছন্দের ব্যাকরণ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন।

তামরস— এটিও দ্বাদশাক্ষর পাদ ছন্দ। অক্ষরের বিন্যাস ক্রম — পঞ্চম-অষ্টম-একাদশ ও দ্বাদশ অক্ষর গুরু। অন্যগুলি লঘু।

তামরস:— "হর হর হর শঙ্কর সংহর পাপম্।
ভয়কর করুণাময় নাশয় তাপম্॥"

সমস্ত অযুগ্মবর্ণ গুরু আর যুগ্মবর্ণ লঘু — এইরীতির ছন্দ তূণক। যার ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায় অন্নদামঙ্গলে —

তূণক:— "ভৈল দক্ষ ভূত সাথ শিংহনাদ ছাড়িছে।
তার ফের তুন ফের ছোট বড় বাড়িছে॥"

যেমন 'ছন্দোমঞ্জরী'-তেও ছন্দোদোষ নিয়ে যুক্ত সংস্কৃত ছন্দের নিয়ম যথাযথ

(*) না দেখিব সে নম্র বদন   না হেরিব সে নয়ন
না শুনিব সে মধুর বাণী   ৮+৮+১০

ছন্দকেই পালন করেছেন ভারতচন্দ্র।

(৫৫) সংস্কৃত ছন্দের নির্ভুল ব্যবহারের পাশাপাশি — ত্রিপদী, লঘু ত্রিপদী, চৌপদী, একাবলী, দলবৃত্ত পয়ারের বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহার 'অন্নদামঙ্গলে'র যত্রতত্র লক্ষ্য করা যায়। মিশ্রবৃত্ত রীতিতেও বৈচিত্র্য ছন্দোবন্ধের পরিচয় রেখেছেন —

"অঙ্গ পূর্ণা উক্ত বিলাস / আসি মীর তাঁরে ।। ৮+৬
পাঁর ঠের বলিয়া ভা / ঠিলা পাঁচু নীরে ।" ৮+৬

রতি বিলাপের করুণ আবহটি অঙ্কিত হয়েছে দীর্ঘ ত্রিপদীর বিস্তারে —

(*) অরে নিদারুণ প্রাণ   কোন পথে পতি যান
আনে মোরে পথ দেখাইয়া   ৮+৮+১০.

আবার দিগ্মালী ছন্দের ব্যবহারেও তাঁর নিপুণতা অনস্বীকার্য —

"আমার উমা / মেয়ের চূড়া / ছেড়ে পাগল / ওই না বুড়া / ৪+৪+৪+৪
ভারত কহে / পাগল নহে / ওই ভুবনেশ্বর দেখো ।।" ৪+৪+৪+২

একাবলী ছন্দের ব্যবহার — "সেই বিশ্বনাথ / বিশ্বের সার।
কেবা দেয় তব / ফেরিতে পার।।"

ভারতচন্দ্র কেবল ছন্দের কারিগর শিল্পী ছিলেন না, ছিলেন ছন্দের অনুকরণকে যথাযথ ভাবে কাজে লাগিয়ে নিজের শিল্পীসত্তা প্রকাশে নিরলস।

(৬৬) ছন্দের মতো অলংকার প্রয়োগেও ভারতচন্দ্র অনবদ্য শিল্পী। রাজসভার কবি হিসাবে ভারতচন্দ্রকে অনেকাংশে মনোরঞ্জনের জন্য লেখনী ধারণ করতে হয়েছিল। সেক্ষেত্রে আলংকারিক বৈদগ্ধ্যে তাঁর কাব্য আদ্যন্তই সমৃদ্ধ। তাঁর কাব্যগ্রন্থে মূলত আলংকারিক শব্দালংকার এবং অর্থালংকার উভয়েরই ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় —

অনুপ্রাস — "ঘর্ঘর ঘুরান ঘোর ঘন ঘন ভাকে।" — কেন ফেলিল আলিকুল কুসুমপুরে

যমক — 'ভারত ভারত খ্যাত আপনার গুণে।'

শ্লেষ — "অর্ধেক বয়স রাজা তার পাটরানী।
পাঁচপুত্র নৃপতির মধ্যে যুবরানী।।" (শব্দশ্লেষ)

ব্যাজস্তুতি — "অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নেই তার কপালে আগুন।।" (অর্থশ্লেষও হয়)

বিশেষোক্তি — "যদি করি বিষপান   তথাপি না যায় প্রাণ
অনলে সলিলে মৃত্যু নাই।"

ব্যতিরেক — "কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ে তার আছে কত গুলা।।"

সন্দেহ — "বিষ্ণুর বৈষ্ণবী কিম্বা শিবের শিবানী।
ব্রহ্মার ব্রাহ্মণী কিম্বা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী।"

অসঙ্গতি — ভেকের কপালে রহে আগুন কপালদাহ
কপালের কপালে আগুন

বিরোধাভাস — 'অচক্ষু সর্বত্র চান   অকর্ণ শুনিতে পান
অপদ সর্বত্র গতাগতি।'

ভাষা-ছন্দ-অলংকারের এমন ব্যবহার লক্ষ্য করেই প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন —

-তুক অধ্যায় তার সমগ্র সাহিত্যের উৎকর্ষ।' এজন্যই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন — "রাজ-সভার কবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান রাজকণ্ঠের মণিমালার মতো, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা, তেমনি তাহার কারুকার্য।"

(১১) 'ভারতচন্দ্রের জীবন সর্বদাই বৈভবময়, লাবণ্যময়, প্রবহমান" (রমেশ-চন্দ্রদত্ত)। তাঁর ভাষা- স্বচ্ছ - উজ্জ্বল - মার্জিত। "তাঁর মধ্যে আবেগ ছিল, আন্তরিকতা ছিল না; নীতি ছিল, ছিল না ধর্মবোধ; তাতে যুক্ত হয়েছিল নাগরিক বুদ্ধি কিন্তু আত্মলীন মগ্নতা নয়; সেখানে যে উজ্জ্বলতা, তা নয় সুস্নিগ্ধ মঙ্গলতা।" ([illegible]-সম্পাদক)। বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাসের ভাষায় শিল্প নিপুণতা ছিল বটে কিন্তু সে ভাষা বড়বেশি পোশাকী। ভারতচন্দ্র তাঁর ভাষায় যে পোশাক পরিয়েছেন তা কিন্তু একাধারে মনোহারী ও অনির্বেয় করেছে। সচেতন শিল্পী মনের রসসৃষ্টির প্রয়াস তাঁর কাব্যে সার্থক হয়েছে। রীতি বৈচিত্র্যের জন্যই ভারতচন্দ্রের রচনা আজও বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অম্লান হয়ে রয়েছে।

সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

অন্নদামঙ্গল কাব্যের গীতিকাব্য ধর্মীতা।

●● জীবনের বিচিত্র রূপায়ণ ঘটে সাহিত্যে, আর সেই জন্যই সাহিত্যের বিষয় ও আঙ্গিককে হতে হয় বৈচিত্র্যমণ্ডিত। জীবনের অনুকরণজাত সাহিত্যের পরিচয় কেবলমাত্র একটি বিষয় বা একটি আঙ্গিককে সীমাবদ্ধ থাকে না। জটিলতর জীবনজিজ্ঞাসার সাক্ষী হয়ে আধুনিক সাহিত্যে এই নবনতার বহিঃপ্রকাশ কিছুটা উচ্চকিত। তবে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই সংরূপ বৈশিষ্ট্যকে নিজের মধ্যে লালন করেছে। 'চর্যাপদ' তাই আর কেবল বৌদ্ধ সহজিয়াদের সাধনতত্ত্বের দুরূহ ব্যাখ্যা মাত্র নয়, তা দশম-দ্বাদশ শতকের নিম্নবর্গ অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের জীবন জীবিকার, দুঃখদৈন্য জীবন সংকটের প্রতিলিপি। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কেবল রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা-বিষয়ক কাব্য নয়, সমাজসমালোচনায় তুর্কীদের আকস্মিক আক্রমণের বিধ্বংসী ঐতিহাসিক দলিলও বটে। কাব্যের কাঠামোকে পুরোপুরি গ্রহণ করেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন - পূর্ববঙ্গ গীতিকা - ইত্যাদিতে রয়েছে পর্যাপ্ত নাট্যলক্ষণ। এমনকি কবিকঙ্কনের 'চণ্ডীমঙ্গলে' উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যও ফুটে উঠেছে কোথাও কোথাও। এইভাবে মধ্যযুগের প্রচলিত কাব্যবন্ধে রচিত শেষ কাব্য 'অন্নদামঙ্গলের' আখ্যানবর্ণনায় মিশে আছে গীতিকবিতার আত্মগত আবেদন।

●● বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধে বলেছেন - 'গীতের যে উদ্দেশ্য যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতা মাত্র যাহার উদ্দেশ্য সেই কাব্যই গীতিকাব্য।' গীতিকাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য সুরধর্মিতা এবং আত্মনিষ্ঠ আবেগময়তা। 'অন্নদামঙ্গল' রচনার আগে ভারতচন্দ্র 'রসমঞ্জরী' নামে একটি শৃঙ্গার রস বিষয়ক ক্ষুদ্রকাব্য রচনা করেছিলেন। 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধে বঙ্কিম 'রসমঞ্জরী'কে মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যের মধ্যে গীতিকাব্যের নিদর্শন বলে পরিচিতি দিয়েছেন। 'রসমঞ্জরী'র অন্তর্গত পদগুলির মধ্যে গীতিকবিতার আভাস লক্ষ্য করা যায় -

> "ঝরি ঝরি ঝরে মদন বাইল : চলে নিধুবনে কামিনী।
> পিক কলকলি মরালুক ধ্বনি : ফুটে বনফুল ভ্রমর গুনগুনী :
> তাহাতে মিলিত নূপুর রুনু ঝুনী : শীঘ্র চলে মৃদুগামিনী।।" -

কিন্তু তার পরেই ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যরচনায় হাত-পাকিয়ে (অভিসারিকা) ছিলেন। মঙ্গলকাব্যের কাহিনী প্রচলিত আধারের মধ্যেও 'রসমঞ্জরী'-কার ভারতচন্দ্রের উপস্থিতি অনুভব করা যায়।

●● আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময় ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। কৃষিভিত্তিক গ্রামবাংলার স্থিতিশীল গোষ্ঠীজীবনের ভিত্তি তখন অনেকই আলগা হতে শুরু করেছে। পরিবর্তমান সমাজ পরিস্থিতিতে সার্বিক নিরাপত্তাহীনতার উত্তাপ মানুষকে পরস্পর থেকে অনেক দূরে নিয়ে যেতে থাকে। সংস্কৃতি দুর্বিপাকে শাশ্বত আত্মপ্রায়ে এতদিনকার গোষ্ঠী জীবনকে অনায়াসে উপেক্ষা করে মানুষ। তৈরী হয় ব্যক্তি মানুষের আত্মপরিচয় অনুসন্ধানের পর্ব। আধুনিক গীতিকবিতা সৃষ্টির মর্মে যে আত্মনিষ্ঠতা - ঐ অষ্টাদশ শতকের যুগপরিবেশকেই তার জনক রূপে চিহ্নিত করা যায়। গোষ্ঠী জীবন থেকে ব্যক্তি মানুষের জীবন অনুসন্ধানের ছিদ্রপথেই 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে গীতিধর্মিতা প্রবেশ করেছে। শুধু গীতি রসের আবেশে নয় একলা মানুষের অন্তরতম অনুভূতিও এই কাব্যে মহৎ লক্ষ্য।

'অন্নদামঙ্গল' আখ্যান কাব্য। ব্যক্তিহৃদয়ের ব্যক্তিগত আবেগ বেশি আখ্যান কাব্যের রূপরীতিকে দুর্বল করে দেয়। ভারতচন্দ্র এবিষয়ে সচেতন ছিলেন বলে মূল আখ্যান অংশের কোথাও ব্যক্তিঅনুভূতিকে প্রবেশের ছাড়পত্র দেননি। আখ্যানের মধ্যে ব্যবহৃত সংযোজিত গানগুলির মধ্যেই কেবল ভারতচন্দ্রের আত্মভাবনা অযুক্ত হয়েছে। ভারতচন্দ্রের আগে দ্বিজমাধব তাঁর কাব্যে এই ধরনের সংযোজিত গান ব্যবহার করেছেন এবং এগুলিকে বিষ্ণুপদ বলে অভিহিত করেছেন। ভারতচন্দ্র তাঁর পরিমার্জিত জীবনবোধ দিয়ে এই বিষ্ণুপদ গুলিকে ভক্তিমূলক গীতিকবিতার পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছেন। ভক্তিরসে আর শব্দরসের সুষম পারস্পর্যে বিন্যস্ত এই ধরনের একটি উল্লেখ যোগ্য পদ—

" আমারে ছাড়িও না ভবানী।
সুশীলা হইয়া শিলাময় হইয়া
শিলাময় হিয়া হইও না,
এবার পাথারে ফেলিয়া আমারে
দোষ ধারে ধারে লইও না॥ " —

বৈষ্ণব গীতি- কবিতার প্রার্থনা রসসিক্ত ভাবকেও ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যে সার্থক ভাবে রূপদান করেছেন —

" পিরীতে তোমার প্রীতি মোর পিরীতের রীতি
তবে কেন মোর নীতি দেখে ভাব পর হে।
ভারত কাতর হয়ে ডাকে শিব শিব কয়ে
ধরমদী পারে লয়ে দূর কর ভয় হে॥ "

শাক্তপদাবলীর মধ্যে ভক্তিমূলক গীতিকবিতার যে আবেদন রয়েছে তার উৎস সন্ধান করতে গেলেও 'অন্নদামঙ্গল' এর দারস্থ হতে হয়। প্রীতিরসে সিক্ত ভক্তিভাবনার অনন্য রূপায়ণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভক্তিমূলক গীতি-কবিতায় পর্যবসিত হয়েছে—

" উমা দয়া কর মা।
বিষম শমন ভয় হর মা॥
পাপেতে জড়িত মতি অস্থ হয়েছি অতি
পতিত পাবনী নাম ধর মা। "

কাশীতে দেবী অন্নপূর্ণার আবির্ভাব বিষয়ে অনবদ্য রূপকল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন ভারতচন্দ্র —

" কল কোকিল অলিকুল বকুল ফুলে।
বসিলা অন্নপূর্ণা মণি দেউলে।
কমল পরিমল লয়ে শীতলজল
পবনে ঢলঢল উছল কূলে। " —

দেবীবন্দনার আবহটি বিযুক্ত করতে পারলে এই পদটিকে নির্দ্বিধায় প্রকৃতিপ্রেম-মূলক গীতিকবিতা রূপে গ্রহণ করা যায়।

তবে ভারতচন্দ্রের মধ্যযুগ কবিসত্তার সমৃদ্ধি ঘটেছে — 'বিদ্যাসুন্দর' কাহিনীতে। ভারতচন্দ্রের আবেগ এখানে তরঙ্গায়িত হয়ে সংস্কৃত ছন্দমাত্রায় আবদ্ধ হয়েছে —

" ওহে বিনোদরায় ধীরে যাও হে।
অধরে মধুর হাসি বাঁশীটি বাজাও হে॥
নব জলধর তনু শিখিপুচ্ছ শক্রধনু
পীতধড়া বিজুলিতে ময়ূর নাচাও হে। "

ব্যক্তিভাবাপন্ন কবিসত্তা শুধু গীত রূপ সৃষ্টিতেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না, নিজেকে প্রকাশ করার জন্য সে সর্বদা উন্মুখ। মঙ্গলকাব্যের শুদ্ধতা রক্ষার খাতিরে যে কথা কবি নিজের মুখে উচ্চারণ করতে পারেননি সেই ব্যক্তিকথাকে প্রকাশ করার তাগিদেই ব্যাসচরিত্রের সৃষ্টি। ব্যাসদেবকে দিয়ে কবি বলিয়ে নিলেন —

" শরীর ধরিনু যদ্যু তোমারে ভাবিয়া,
জিহুন বাড়িল তব ব্যাসেরে ছলিয়া॥"

গীতিকাব্যের সাফল্যের অন্যতম প্রধান শর্ত 'concrete idea', ধারণা নির্মূল হলে অনুমোদনের সুর এতো নরম রাখাও সম্ভব নয় সর্বত্র। সেইজন্যই খেয়ানো জেলের মুখেই শ্লেষ পড়তে হয়েছে দেবতাকে। 'পুরবর্ণন' অংশের বিষ্ণুপদটিতে ভাবীকালের গীতি কবিতার পূর্বাভাস সার্থক হয়ে উঠল —

" নিত্য তুমি খেল যাহা নিত্য ভাল নহে তাহা
আমি যে খেলিতে চাহি সে খেলা খেলাও হে।"

— সম্পূর্ণরূপে ভক্তি তথা সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে উঠে আত্মচেতনার সম্প্রসারণ এখান থেকেই শুরু হয়েছে।

'অন্তর ব্যক্তি ভাবের পরিস্ফুটন' যদি গীতি কবিতার লক্ষ্য হয় তাহলে 'রতির বিলাপ' কেও সার্থক গীতিকবিতার একটি নিদর্শন বলা যায়। বৈধব্য যন্ত্রণার অনবদ্য প্রকাশ যে কোন পাঠককেই বিমূঢ় করে তুলতে সক্ষম —

" না দেখিব সে বদন — না হেরিব সে নয়ন
না শুনিব সে মধুর বাণী
আগে মরিবেন স্বামী পশ্চাতে মরিব আমি
এতদিন ইহা নাহি জানি॥"

'বিদ্যাসুন্দরের দর্শন' অংশটিতে এবং সেও অসাধারণ গীতিমূর্ছনা —

" শিহরিল কলেবর তনু কাঁপে থরথর।
হিয়া হৈল জর জর আঁখি ছলছল॥"

ডঃ বিমলা কান্ত মুখোপাধ্যায় বলেছেন — " (ভারতচন্দ্র) ... মহাকাব্যরচনার মধ্যে মধ্যে লিরিক উচ্ছ্বাসের মাধ্যমে কবি নিজ হৃদয়ের অনুভূতিকে মুক্তি ও ভাষারূপ দিয়েছেন। "

গীতিকবিতা রচনায় ভারতচন্দ্র আগ্রহী ছিলেন। 'অন্নদা-মঙ্গল' কাব্যে প্রাপ্ত খণ্ডকবিতাগুলিতে কবির সেই মানসিকতাই ধরা পড়েছে। কিন্তু গীতি কবিতা রচনার জন্যে যে যতখানি অন্তরঙ্গতা প্রয়োজন ছিল মধ্যযুগের জড় দেহে ভারতচন্দ্র তা অর্জন করতে পারেন নি। তাই তাঁর কাব্য যথার্থ অর্থে গীতি কবিতা হয়ে উঠতে পারেনি। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় ভারতচন্দ্রের প্রতিভা গীতি কবিতা রচনার অনুকূল ছিল। ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন— "যুক্তিতর্কের প্রধান গীতি কবিতার রূপ ও রস আধুনিক কালের ব্যাপার। দেবতার অধীন মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে ব্যক্তিনিষ্ঠ গীতিকবিতার ততটা প্রচলন না হবারই সম্ভাবনা। কিন্তু ভারতচন্দ্র আপনার অজ্ঞাতসারে ঊনবিংশ শতাব্দীর গীতি কবিতার পথ খনন করিয়া দিয়াছেন।" যুগকে অতিক্রম করার শক্তি ভারতচন্দ্রের মধ্যে ছিল বলেই দেবতার অধীন মধ্যযুগের প্রতিনিধি হয়েও গীতিকবিতার পথ প্রস্তুত করতে সাহসী হয়েছিলেন। অষ্টাদশ শতকে ভারতচন্দ্র যে পথে অগ্রসর হবার সুযোগ পাননি কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে গীতিকবিতার পরিণতির লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করেছিল ঐ পথ ধরেই। ভারতচন্দ্র গীতিকবি ছিলেন না কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর গীতিকবিরা তাঁরই উত্তরাধিকারী।

সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

(চেকসিট)